Boighar.com

বইঘর নিবেদন BABD

মুসাফির

শফীউদ্দীন সরদার

রোকন

বইঘর

মুসাফির

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

মদীনা পাবলিকেশন্স
www.boighar.com
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ শাখা ঃ ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মুসাফির

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

প্রকাশক ঃ

মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে

মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ ঃ

অমর একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ইংরেজি

মহররম-১৪২৬ হিজরী

ফাল্গুন-১৪১১ বাংলা

www.boighar.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ

মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

আস-সালাম কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন

৪৫ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

www.boighar.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মদীনা প্রিন্টার্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8631-01-1

মূল্য ঃ ৮০ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

মুসাফির

www.boighar.com

মুসাফির

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

www.boighar.com

এক.

নূরপুর একটি বর্ধিষ্ণু গাঁ। কিছুদিন যাবৎ এক মুসাফির এসে বাস করছেন এই নূরপুরের কাজী বাড়িতে। কাজী বাড়ির প্রধান মকছেদ আলী কাজী সাহেব এক বন্দর থেকে নিয়ে এসেছেন এই মুসাফিরকে। মুসাফিরটির সাথে কাজী সাহেবের ঐ বন্দরেই আলাপ। মুসাফির সাহেবের গভীর দীনি এলেমের পরিচয় পেয়ে কাজী সাহেব তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন দু'টি বিশেষ উদ্দেশ্যে। এক, তাঁকে বাড়ির ওয়াক্তিয়া মসজিদের ইমাম নিয়োগ করা আর দুই, বাড়ির বাল-বাচ্চাদের কিছু দীনি এলেম শিক্ষা দেয়া। এ ঘটনা কিছুদিন আগের।

এই কাজী মকছেদ আলী সাহেবের পাড়াতেই আর কিছুটা তাঁর বাড়ির কাছেই মীর পরিবার নামের আর এক পরিবারের বাস। মীর পরিবার কাজী পরিবারের চেয়ে অনেক বেশি বিত্তশালী ও গণ্যমান্য পরিবার। পাঁচ গাঁয়ের চেনাজানা। মীর পরিবারের মীর মোতাহার হোসেন সাহেব ঐ এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দীনের প্রতি ইতোপূর্বে মীর পরিবারের আকর্ষণটা কাজী পরিবারের মতো এত গভীর ছিল না। ঢিলেঢালা আর সাদামাটাভাবে ইসলাম পালন করতেন তাঁরা। এক্ষণে এবং নানা কারণে মীর মোতাহার হোসেন সাহেবের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেলেও এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

www.boighar.com

বিভিন্ন দিক দিয়ে তিনি এখন হীনবল হয়ে পড়েছেন। পুরুষ মানুষ বলতে বাড়িতে তিনি একা হওয়ায় আর নিজে তিনি নিরতিশয় বৃদ্ধ লোক হওয়ায়, বাড়িতে ওয়াক্তিয়া মসজিদ চালু করার মতো কোন সুযোগ আর হয়ে উঠেনি তাঁর। সুযোগ হয়ে উঠেনি তাঁর দীনের খেদমতে আরো অনেক কিছু করার। বয়স এখন তাঁর নব্বইয়ের কাছাকাছি। লাঠির উপর ভর দিয়ে চলেন। সাধ এখন জাগলেও, সাধ্যের অভাবে তাই সে সাধ তিনি পুরোপুরি পূরণ করতে পারেননি।

এক মুসাফির সাহেব এসে জেনারেল লাইনে শিক্ষারত কাজী বাড়ির বাচ্চাদের দীনি এলেম শিক্ষা দিচ্ছেন শুনে মীর সাহেবও তাঁর জেনারেল লাইনে অধ্যয়নরত প্রনাতি অর্থাৎ নাতনির পুত্র, ইউসুফ আলীকে দীনি এলেম শিক্ষা দিতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মীর পরিবারের অন্যতম পুরুষ সদস্য বলতে মীর সাহেবের এই একমাত্র দশ বছরের প্রনাতি (নাতনির পুত্র) ইউসুফ আলী। পরিবারে আর যাঁরা আছেন, সবাই তাঁরা মেয়েছেলে আর তাঁরা সংখ্যাতেও খুবই কম। এঁদের

মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য আর সকল দিক দিয়ে দক্ষ মহিলা হলেন মীর সাহেবের নাতনি জাহানারা বেগম জেরিনা। এই জাহানারা বেগম জেরিনার নেতৃত্বেই মীর মোতাহার হোসেন সাহেবের সংসারটা চলে এখন।

মীর সাহেব তাঁর এই প্রনাতী ইউসুফ আলীকেও কাজী বাড়ির ঐ মুসাফিরের কাছেই দীনি এলেম শিক্ষা দিতে খুবই ইচ্ছুক হলেন। এই মর্মে তিনি একদিন দেখা করলেন কাজী মকছেদ আলী সাহেব আর ঐ মুসাফির সাহেবের সাথে এবং ব্যক্ত করলেন তাঁর ইচ্ছের কথা। সেই সাথে কিছুটা অনুরোধও পেশ করলেন তিনি। তালেবে এলেম একজন হওয়ায়, কাজী সাহেব আর মুসাফির সাহেবের আপত্তি করার তেমন কিছুই ছিল না। তাই তাঁরা সাগ্রহেই আর সসম্মানেই রক্ষা করলেন মীর সাহেবের অনুরোধ। অর্থাৎ রাজি হলেন মীর সাহেবের প্রস্তাবে। ছেলেটিকে যথা সত্বর পাঠিয়ে দিতে বললেন। www.boighar.com

খোশ দিলে ফিরে এলেন মীর সাহেব। শুনে আরো খুশি হলেন মীর সাহেবের নাতনি জাহানারা বেগম জেরিনা। ইউসুফ আলীকে পাঠাতে তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। মুসাফির সাহেব কাজী বাড়ির বাল-বাচ্চাদের দীনি এলেম শিক্ষা দেন ফজরের নামাযের পরে পরেই। এরপর তারা সাধারণ শিক্ষাগ্রহণের জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়ে যায়। মীর সাহেবের নাতনির ছেলে ইউসুফ আলীও দীনি এলেম শিক্ষা করতে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক প্রতিদিন কাজী বাড়িতে আসতে লাগলো অতঃপর।

দুই.

চলতে লাগলো ইউসুফ আলীর দীনি এলেম শিক্ষা। সেই সাথে দিন দিন বাড়তে লাগলো উস্তাদ, তথা মুসাফির সাহেবের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা। ইউসুফ আলী সকল সৎ ব্যক্তির কাছেই একটি প্রিয় ছেলে। সে একাধারে মেধাবী, দর্শনধারী ও অত্যন্ত সৎস্বভাবের অধিকারী। বিনম্র, মার্জিত, সত্যবাদী ও সদা প্রফুল্ল ছেলে সে। পাঠ গ্রহণে মনোযোগও তার আকর্ষণীয়ভাবে গভীর। তার তুলনায় কাজী বাড়ির ছেলেরা অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল, বখাটে আর পাঠ গ্রহণে অমনোযোগী। এতে করে অতি অল্প দিনেই ইউসুফ আলী মুসাফির সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো।

মুসাফির সাহেবও অনেকের দৃষ্টি কাড়ার মতোই এক ব্যক্তি। বয়সটা চল্লিশের কিছু উপরে। মুখমণ্ডল প্রায় গোটাটাই ঘনকৃষ্ণ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। গায়ের রঙ অস্বাভাবিক রকমের ধবধবে। উন্নীত ললাট, প্রশস্ত বক্ষ, সুঠাম শরীর। দীনি এলেমের পাশাপাশি অনেকখানি সাধারণ এলেমও হাসিল করেছেন তিনি। জ্ঞান বুদ্ধি তাঁর তীক্ষ্ণ, বোধশক্তি প্রখর এবং আদব-আক্কেল আচরণে তিনি অনেকটা পীর-মাশায়েখ পর্যায়ের এক ব্যাক্তি। হাসি নেই তাঁর মুখে, আসক্তি নেই তাঁর মনোরম কোন কিছু অবলোকনে। তবে উপরটা খানিকটা কঠিন আর

গুরুগম্ভীর হলেও, এই মুসাফিরের ভেতরটা বেশ নরম ও সরস। অনেকটা ঝুনো নারকেলের মতো। তাই তাঁর ভেতরের সন্ধান যে পায়, তাঁর কাছেই এই মুসাফির প্রিয়জন হয়ে ওঠেন।

মেধাবী ছেলে ইউসুফ আলীও অচিরেই টের পেলো মুসাফির সাহেবের ভেতরটা আর এতে করে মুসাফির সাহেবও ইউসুফ আলীর প্রিয়জন হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ভয়ে ভয়ে গেলেও, অচিরেই ইউসুফ আলীর কেটে গেল সব ভয় এবং অল্পদিনেই এই মুসাফিরের সাথে সে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। গড়ে উঠলো অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ফাঁকে অবসরে এখন এই দু'য়ের মধ্যে লেখাপড়ার বাইরের অনেক বিষয় নিয়ে গল্পালাপ হয়। গল্পালাপ হয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় নিয়েও।

একদিন মুসাফির সাহেব তালেবে-এলেম ইউসুফ আলীকে প্রশ্ন করলেন– তোমার বাড়িতে কি আর কোন বাল-বাচ্চা আছে? মানে পড়াশুনা করার উপযোগী?

জবাবে ইউসুফ আলী বললো– জি না হুজুর। বাল-বাচ্চা বলতে আমি একাই।

ঃ একাই? তাহলে বাড়িতে আর কে কে আছে তোমার?

ঃ তেমন কেউ নেই হুজুর। শুধু আমার আম্মা আর আম্মার নানাজান আছেন। তাঁরা ছাড়া আপন বলতে আর কেউ নেই। অন্য যারা আছে, সবাই তারা ঝি-চাকর।

মুসাফির সাহেব সবিস্ময়ে বললেন, বলো কি? তোমার আম্মার নানাজান? মানে, তোমার আম্মাজানের নানা?

ঃ জি হুজুর। অত্যন্ত বৃদ্ধলোক। তাঁকে তো দেখেছেন আপনি। আপনার কাছে একদিন নাকি এসেছিলেন?

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি। খুবই বৃদ্ধ লোক। তাহলে তোমাদের সংসারটা চালান কে? তোমার আম্মার নানাজানের যা বয়স, তাতে তো তাঁর পক্ষে সব দিক সামাল দেয়া সম্ভব নয়?

ঃ না হুজুর, তিনি তা পারেন না। সংসারটা বলতে গেলে আমার আম্মাই চালান।

ঃ তোমার আম্মাই? তা তোমার আব্বা নেই? মানে, তিনি কি মারা গেছেন?

ঃ না-না, মারা যাবেন কেন? তিনি আছেন হুজুর। তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে থাকেন।

ঃ নিজের বাড়িতে?

ঃ জি জি। এটা তো আম্মাজানের নানার বাড়ি, আমার আব্বার বাড়ি নয়। আব্বার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে।

ঃ বলো কি!

ঃ আমার আম্মা দুইজন। আমার আর এক আম্মা আমার আব্বার সাথে দূরে ঐ আব্বার বাড়িতে থাকেন।

ঃ আচ্ছা। তা তোমার আম্মার নানাজানের নাম তো মীর মোতাহার হোসেন সাহেব, তাই নয় কি?

ঃ জি হুজুর, জি-জি।

ঃ তাঁর নাকি অনেক বিষয়-বিত্ত? অর্থাৎ অনেক টাকা-পয়সা আর জমি-জমা?

ঃ জি হুজুর, অনেক অনেক। খুবই বড়লোক আমার আম্মার নানাজান। অনেক জমি আছে। বাজারে অনেক দোকানবাড়ি ভাড়া দেয়া আছে।

ঃ তাহলে সেসব কে দেখাশোনা করে?

ঃ কেন হুজুর! চাকর-বাকর আছে, কর্মচারী আছে, তারা ওসব করে।

ঃ আরে বাবা, তাহলে তাদের কে চালায়? কর্মচারী আর চাকর-বাকরদের চালানোর জন্যেও তো লোক দরকার। তাদের কাজকাম আর হিসেবপত্র বুঝে নেয়া, তাদের মাইনেপত্র দেয়া এসব কে করেন? তোমার আম্মার নানাজানই কি করেন?

ইউসুফ আলী চিন্তিত কণ্ঠে বললো– তাতো ঠিক বলতে পারবো না হুজুর! তবে মনে হয়, আমার আম্মাজানই সব করেন। তাঁর নানাজান তো সবসময় শুয়ে-বসে থাকেন। এসব করতে তেমন দেখিনে।

ঃ তোমার আম্মাজানই করেন?

ঃ তাই তো মনে হয়। কর্মচারী আর চাকরদের সাথে আম্মাকেই তো সবসময় কথা বলতে দেখি।

ঃ তাজ্জব! তোমার আম্মাজান কি তাহলে ভাল লেখাপড়া জানেন? অন্তত এসব চালানোর মতো?

দু'চোখ বিস্ফারিত করে ইউসুফ আলী বললো– জানেন, কি বলছেন হুজুর। অনেক লেখাপড়া জানেন। উনি তো এখানকার গার্লস্ ইস্কুলের মাস্টার।

বিস্মিত হলেন মুসাফির। বললেন– অ্যাঁ! গার্লস্ স্কুলের মাস্টার? মানে শিক্ষিকা।

ঃ জি হুজুর।

ঃ কি আশ্চর্য! তাহলে সে সময় পান কি করে তিনি? এতবড় সংসার সামাল দেয়ার পরও স্কুলে যাওয়ার সময় পান কোথায়?

ঃ তাই তো যান হুজুর। আম্মা বলেন, সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে থাকা ভাল লাগে না তাঁর।

একটু হোঁচট খেলেন মুসাফির সাহেব। গলা ঝেড়ে বললেন– ও আচ্ছা। তাহলে খুব বাইরে বাইরে থাকেন তিনি, তাই নয়?

ঃ থাকেনই তো। ইস্কুলের ছুটি না হলে তো বাড়ি আসেন না! অনেকক্ষণ থাকেন।

ঃ ঐ স্কুলে যাওয়া ছাড়া কি আর কোথাও যান না?

ঃ আর কোথায় হুজুর?

কোথায় মানে– নানারকম সভা-সমিতি বা ফাংশান-অনুষ্ঠানে? যাত্রা-নাটকও তো শুনি মাঝে মাঝেই হয় এখানে!

মাথা নিচু করলো ইউসুফ আলী। লজ্জিত কণ্ঠে বললো– তওবা তওবা! আম্মাজান বোরকা পরে শুধু ইস্কুলেই যান। ওসব জায়গায় যেসব মেয়েছেলে যায়, আম্মাজান তাদের পছন্দ করেন না। বলেন, ওসব পাপ।

অনেকখানি প্রসন্ন হয়ে উঠলো মুসাফিরের মুখমণ্ডল। তিনি বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে রোযা নামাযও করেন তিনি নিশ্চয়ই?

কণ্ঠে জোর দিয়ে ইউসুফ আলী বললো– খুবই খুবই। দিনের বেলায় তো আছেই, শেষ রাতেও উঠে উঠে নামায পড়েন তিনি।

ঃ সোবহান আল্লাহ। তাহাজ্জতের নামাযও পড়েন তাহলে?

ইউসুফ আলী আমতা আমতা করে বললো– সেটা তো বলতে পারবো না হুজুর। সবে নামায ধরেছি আমি। সব নামাযের ঠিক ঠিক নাম বলতে পারবো না। পাঁচ ওয়াক্তের নামটাই শিখেছি কেবল।

ঃ ও আচ্ছা– আচ্ছা।

ঃ হুজুর!

ঃ তোমার আম্মাজান তাহলে খুবই নেকমান্দ মহিলা দেখছি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হায়াত দারাজ করুন।

এদিন এই পর্যন্তই দুই ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কথাবার্তা হলো। কাজী বাড়ির বাল-বাচ্চারা কলরবে এসে পড়ায় তাদের কথাবার্তা এদিন আর এগুলো না।

এরপর দু'চার দিন এই উস্তাদ-সাগরিদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে নানা আলাপ হলো। মুসাফির সাহেব এসব নিয়ে অনেক কথা বললেন। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দিক তিনি আর টানলেন না। অবশ্য অল্প একটু টানলেন তাঁর সাগরিদ। একদিন ইউসুফ আলী ইতস্তত করে বললো– একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো হুজুর? কোনো কসুর নেবেন নাতো?

মুখ তুলে মুসাফির সাহেব বললেন– কসুর! না- না, কসুর নেবো কেন? বলো, কি বলতে চাও!

ইউসুফ আলীর সংকোচ তবু গেল না। সে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে বললো– সবাই জিজ্ঞাসা করে, আমি বলতে পারিনে। আপনার নামটা কি হুজুর?

হুজুর ঈষৎ হেসে বললেন– নাম? ও আচ্ছা। এটা জিজ্ঞাসা করতে এত শরম পাচ্ছো কেন? আমার নাম আজিজুল হক। মুহম্মদ আজিজুল হক।

সাহস পেয়ে ইউসুফ আলী ফের প্রশ্ন করলো– আপনার বাড়ি কোথায় হুজুর?

ঃ বাড়ি? বাড়ি অনেক দূরে। এখান থেকে সোজা পশ্চিমে তিন-চারটে জেলার ওপারে।

ঃ ওখানে কেউ নেই হুজুর? মানে, আপনার ছেলেমেয়ে আর তাদের আম্মা?

থেমে গেলেন মুসাফির। পরে উদাস কণ্ঠে বললেন– নারে বাবা, ওসব কিছু নেই।

ঃ নেই হুজুর?

ঃ না, নেই।

হুজুর নীরব হলেন। হুজুরকে অনাগ্রহী দেখে নীরব হলো ইউসুফ আলীও।

সপ্তাহখানেক পরে আবার ইউসুফ আলীর বাড়ির কথা উঠলো কথার প্রসঙ্গে। মাঝখানে দু'দিন ইউসুফ আলী হুজুরের কাছে এলো না। দু'দিন পরে সে আবার এলে মুসাফির সাহেব প্রশ্ন করলেন– কি ঘটনা ইউসুফ, পর পর দু'দিন তুমি এলে না যে?

ইউসুফ আলী বললো– আমার অসুখ হয়েছিল হুজুর। জ্বর হয়েছিল।

ঃ জ্বর?

ঃ জি, সর্দিজ্বর। সেদিন অনেকক্ষণ বৃষ্টির পানিতে ভিজলাম তো, তাই সর্দিজ্বর হয়ে গেল।

ঃ বৃষ্টিতে ভিজলে কিভাবে? কোথায় গিয়েছিলে?

মাতা নিচু করে ইউসুফ আলী বললো– কোথাও যাইনি হুজুর। বাড়িতেই ইচ্ছে করে ভিজেছি। ভীষণ গরম লেগেছিল, তাই বৃষ্টি এসে গেলে ইচ্ছে করেই অনেকক্ষণ ভিজলাম। অনেকক্ষণ।

ঃ সে কি! তা করলে কেন? অধিক ভিজলে অসুখ করে, সেটা তুমি জানো না।

ঃ বুঝতে পারিনি হুজুর। খেয়ালও ছিল না।

ঃ কেউ খেয়াল করে দেয়নি তোমাকে? অধিকক্ষণ ভিজতে নিষেধ করেনি কেউ?

www.boighar.com

ঃ হুজুর।

ঃ বাড়িতে কেউ ছিল না?

ঃ ছিল হুজুর, আম্মা ছিলেন। ঘরের মধ্যে তিনি হিসেবপত্র নিয়ে ছিলেন। আমি কি করছি, তা তিনি দেখার সময় পাননি।

ঃ না-না, তোমার আম্মার এটা ঠিক হয়নি। তোমার দিকে নজর রাখা উচিত ছিল তাঁর।

ঃ ঠিকই বলেছেন হুজুর। আমার আম্মার নানাজানও আম্মাকে এই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, দেখো জেরিনা, সংসার নিয়েই কেবল ব্যস্ত থাকছো তুমি, ছেলেটার দিকে মোটেই নজর রাখছো না।

মুসাফির সাহেব বিষণ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– কি বললে– কি বললে? তোমার আম্মার নামটা যেন কি বললে?

ঃ জেরিনা হুজুর, আমার আম্মার নাম জেরিনা।

ঃ জেরিনা, না জরিনা?

ঃ না-না, জেরিনা হুজুর। জরিনা নয়।

ঃ কি তাজ্জব। ওরকম একজন পরহেজগার মহিলার নাম জেরিনা হয় কি করে? ভাল কোন মুসলমান নাম খুঁজে পাননি তোমার নানা-নানীরা?

ঃ হুজুর।

ঃ জেরিনা, কোজিনা, এরিনা, আইভি– এসব তো অন্য জাতের মেয়েদের নাম। যারা ইসলাম মানে না তাদের নাম।

ইউসুফ আলী ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– ওটা আমার আম্মার ডাক নাম হুজুর। আম্মার নানাজান তাঁকে ঐ নামেই ডাকেন।

মনঃপুত না হওয়ায় এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেন মুসাফির সাহেব। এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে গেলেন।

তিন.

নূরপুর একটি বর্ধিষ্ণু গাঁ-ই নয় শুধু, ছোট-খাটো একটা বন্দর এলাকা। এখানে হাট আছে, বাজার আছে, বয়েজ স্কুল-গার্লস্ স্কুল, দোকান-পাট, রাইসমিল, পোস্টাফিস, তহসিল অফিস– সবই আছে। স্থানীয় থানাটা একটু ফাঁকে হলেও হাটে-বাজারে, দোকান-পাটে এইটেই থানাসদর। ইদানীং চালু হয়েছে একটা সিনেমা হলও। কি নেই এখানে?

গ্রাম থেকে বেরিয়ে একটা কাঁচা সড়ক খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর খেয়াঘাটে গেছে। এর ফলে এই সড়কে প্রায় সবসময়ই লোক চলাচল করে। নদীটাও বেশি নয়। সকালে-বিকেলে অবসর লোকেরা পায়চারি আর হাঁটাহাঁটি করার জন্যে ছায়াঘেরা এই নদীর পথটাই বেছে নেয়। সড়কের দুই ধারে গাছ-গাছালি থাকায়, রোদের তাপ গায়ে তেমন লাগে না।

মুসাফির আজিজুল হক সাহেব ইদানীং মাঝে মাঝেই এই দিকে আসেন। জোহরের নামাযের পর বেলা একটু পড়ে এলেই তিনি বেরিয়ে আসেন এই সড়ক বেয়ে আর এদিক-সেদিক ঘুরে আসরের নামাযের পূর্বমুহূর্তে আবার ফিরে যান কাজী বাড়িতে।

এই ঘুরে বেড়ানোর কালে মুসাফির সাহেব এখন প্রায়ই রাস্তার ধারে গেদু মিয়ার টি-স্টলে, অর্থাৎ চায়ের দোকানে বসেন আর বিরাম নেয়ার সাথে চা পান করেন সেখানে।

গেদু মিয়ার এই টি-স্টলের একটু পেছনেই এখানকার সেই গার্লস স্কুল। গার্লস স্কুলের বাউণ্ডারি ওয়াল আর স্কুলের মেইন গেট গেদু মিয়ার টি-স্টলের

অনেকটা লাগালাগি। এই গেট দিয়ে বেরিয়ে গেদু মিয়ার টি-স্টলের সামনে দিয়ে স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ, আয়া-পিয়ন ও শিক্ষিকাগণের যাতায়াতের পথ এবং একমাত্র পথ। স্কুলের অন্য পাশে একটা ডোবা থাকায়, সেটা ভরাট না করা পর্যন্ত এই পথের বিকল্প আর নেই। এই পথে এসেই সবাই সদর রাস্তায়, অর্থাৎ উল্লিখিত কাঁচা সড়কে উঠে।

ফলাফল চিরাচরিত। এতে করে শুধু বখা'টেরাই নয়, বখা'টেদের অনেক বাপেরাও অকারণেই ভিড় জমায় গেদু মিয়ার এই টি-স্টলে। ভিড়টা তুঙ্গে উঠে দিনে দু'বার। এক, স্কুল বসার সময়, দুই, স্কুলের ছুটির সময়। ভিড়কারীদের লাভ এতে কিছু হোক আর না হোক, গেদু মিয়ার বেচা-কেনাটা ভাল হয় এসময়।

গেদু মিয়ার বয়সটা অনেকখানি। পাক ধরেছে তার কানের পাশের চুলে কিন্তু মনের কাছে সে এখনোও তরুণ। মনটা তার কাঁচা। গরিব হলেও সাদাদিলের গেদু মিয়া স্বভাবতই একজন রসিক লোক। মনে তার এখনও গানের কলি ঘন ঘনই বাজে। পাঠশালায় কিছুদিন লেখাপড়াও করেছে সে। একেবারেই অজ্ঞ-অধম নয়।

কিছু দিন ধরে আসা-যাওয়ার ফলে সরস মনের মুসাফিরের সাথে এই রসিক মানুষ গেদু মিয়ার বেশ ভাব জমে ওঠেছে। দু'য়ের মধ্যে প্রায়ই বেশ গল্প-আলাপ হয়। মুসাফির সাহেব দোকানে এলে এখন খুব খুশি হয় গেদু মিয়া। এক কাপ চা বিক্রি হবে, এই বিষয়টা তার কাছে বড় নয়। একজন নামিদামি লোকের সাথে মন খুলে গল্প করার কিসমতটাই তার কাছে বড়।

আজ আসরের নামাযের অনেকখানি আগেই ঘোরাফেরা শেষ করে গেদু মিয়ার স্টলে এসে হাজির হলেন মুসাফির সাহেব। গেদু মিয়ার দোকানে লোক জমেনি তখন। গেদু মিয়া একাই আছে দোকানে। সে দোকানটা ঝাড়ামোছা করছে আর গুণ গুণ করে গান গাইছে– "আতর গুলাপী মান পাট্টা হামারা, মেরোনা জরিয়া জান"।

মুসাফির সাহেবকে আসতে দেখেই গান বন্ধ করলো গেদু মিয়া। উল্লাসভরে বললো– আরে সাধু বাবা যে! আসসালামু আলাইকুম। আসুন-আসুন–

মুসাফির সাহেব স্টলে এসে ঢুকলে গেদু মিয়া ঝাড়ামোছা টুলটা ক্ষিপ্রহস্তে মুছে দিলো আবার এবং খোশকণ্ঠে বললো– বসুন সাধু বাবা, বসুন।

টুলটায় বসতে বসতে মৃদু আপত্তি তুলে মুসাফির সাহেব বললেন– অভ্যাসটা তোমার এখনো গেল না গেদু মিয়া। কতবার তোমাকে বলেছি, আমার নাম মুহম্মদ আজিজুল হক। সাধুবাবা না বলে আমাকে তো হক সাহেব বলতে পারো।

তাঁর কথায় মন না দিয়ে গেদু মিয়া আপনভাবে বললো– তা হক বেহক যা-ই হোক, আপনি আমার কাছে সাধু বাবা। নামেও সাধু বাবা, কামেও সাধু বাবা। চেহারায় চরিত্রে সাধু বাবা ছাড়া অন্য কিছু বললে গুনাহ হবে আমার। কি নির্মল

চরিত্র আপনার। পাপের কোন গন্ধই নেই আপনার কথায় আর চালচলনে। সাধুকে সাধু না বলে অন্য কিছু বলাটা আদবের কি বরখেলাপী নয়, বলুন?

ঃ তাতো বুঝলাম, কিন্তু কোন মুসলমানকে সাধু বাবা বলাটা ঠিক নয়। ওটা অমুসলমানের বেলায় চলে।

গেদু মিয়া বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো– এটা কেমন কথা হলো, বলুন? সেজে থাকবেন সাধু সন্ন্যাসী, অথচ বলতে দেবেন না সে কথা– এটা কি কোন ন্যায়বিচারের কথা হলো?

মুসাফির সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন– আরে সাধু-সন্ন্যাসী সেজে থাকলাম কোথায়? আমি তো গেরুয়া পরে নেই, গলায় রুদ্রাক্ষের মালাও নেই। লেবাস আমার সবই ইসলামী লেবাস। এর মধ্যে তুমি সাধু বাবার গন্ধ পেলে কোথায়?

গেদু মিয়া এবার ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো– এই তো সত্যের বরখেলাপ হলো হুজুর। লেবাস আপনার সব ইসলামী হলেও আপনার মুখের লেবাস দেখলে তো সবার আগে আপনাকে সন্ন্যাসী বলেই মনে হয়।

ঃ গেদু মিয়া!

ঃ বেয়াদবি মাফ করবেন হুজুর। উলুক্ষেতের মতো গভীর আর বিশাল দাড়ি গোঁফ দিয়ে আপনি আপনার মুখখানা এমনভাবে ঢেকে রেখেছেন যে, চেহারা আপনার সনাক্ত করে, সাধ্য কার। এ অবস্থায় হঠাৎ দেখলে, আপনার গর্ভধারিণী জননীও তো চিনতে পারবে না আপনাকে।

ঠেকে গেলেন মুসাফির সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে এর কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে, আপাতত তিনি নীরব হয়ে গেলেন। গেদু মিয়া ফের বললো– আপনি একজন মস্ত বড় আলেম মানুষ বলেই হয়তো একথাটা সাহস করে আপনার মুখের উপর কেউ বলে না। অবশ্য, ব্যাপারটা যে খুবই ধরার মতো, তাও নয়। তবু আড়ালে আবডালে এ নিয়ে যে কেউ কিছুই বলবে না– এমনটা ভাবাও ঠিক নয়। তার চেয়ে একটা্ কাজ করুন হুজুর?

মুসাফির সাহেব উদাস কণ্ঠে বললেন– কাজ?

গেদু মিয়া বললো– একেবারে ফেলে না দেন, নাপিত ডেকে ওগুলো খানিকটা খাটো করে ফেলুন। কি সুন্দর চোহারা আপনার। দাড়ি-গোঁফের তলে থেকেই আপনার মুখের সুন্দর চেহারাটা ঝিলিক মারছে। এমন দর্শনধারী মুখখানা খামাকা এভাবে আড়াল করে রেখেছেন কেন?

মুসাফির সাহেব আরো বেশি উদাস হয়ে গেলেন। টেনে টেনে বললেন– কথটা তোমার একেবারেই ফেলে দেয়ার নয় গেদু মিয়া। মুখের চেহারা দেখানোর জন্য নাহলেও মানুষের অহেতুক কৌতূহল এড়ানোর জন্যই আমার তা করা উচিত। কিন্তু–

মুসাফির সাহেব থেমে গেলেন। গেদু মিয়া ফের প্রশ্ন করলো– কিন্তু কি হুজুর।

মুসাফির সাহেব ঐ একইভাবে বললেন– দাড়ি-গোঁফ খাটো করার সময় যখন হয়েছিল, খাটো করবো-করবো করতে করতে আর খাটো করা হলো না। এরপর দেখতে দেখতে দশবারো বছর পার হয়ে গেল। এতদিন ক্ষুর-কাঁচি যখন লাগানই হলো না, তখন আর সে ইচ্ছে করিনে। থাকনা ওরা ওদেরভাবে। ওরাতো আমার কাছে ভাত-কাপড় চাচ্ছে না।

অজ্ঞাতেই একটু হেসে ফেলেন মুসাফির সাহেব। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকার পর অকস্মাৎ বিকট শব্দে হেসে উঠলো গেদু মিয়া। হাসতে হাসতে বললো- বুঝেছি বুঝেছি, সব বুঝেছি।

মুসাফির সাহেব এবার বিস্মিত হলেন কিছুটা। প্রশ্ন করলেন– বুঝেছো মানে? কি বুঝেছো?

ঃ আপনি লাইলী মজনুর শাদি দেখতে চান।

ঃ লাইলী-মজনুর শাদি।

ঃ হ্যাঁ, যারা জীবনে দাড়ি-গোঁফ কাটবে না, তারা মরার পর লাইলী-মজনুর বিয়ে দেখতে পাবে।

ঃ সেকি! কোথায় পেলে এ কথা?

ঃ কেন, এ কথা তো অনেকেই বলে।

ঃ এ কথা সত্যি নয়।

ঃ সত্যি নয়?

ঃ একথা মানুষের একেবারেই মনগড়া কথা।

ঃ বলেন কি হুজুর! এই ঘটনা তাহলে?

ঃ বিলকুল এই ঘটনা। বিশ্বাস না হয় অন্য উলামায়ে-কেরামদের জিজ্ঞাসা করতে পারো। অন্য কোন জ্ঞানী মানুষও বিশ্বাস করবে না একথা।

গেদু মিয়া এবার শক্ত হয়ে বললো– না হুজুর, আর জিজ্ঞাসা করে দেখবো কি? আপনি যেখানে বলছেন, সেখানে আর কি কোন কথা আছে? আপনার মতো খাঁটি লোক, এ জীবনে আর তো বেশি দেখলাম না।

ঃ গেদু মিয়া।

ঃ আর যা-ই হোক, আপনি যে মিথ্যা বলার লোক নন, এটা আমি নিখুঁতভাবেই বুঝে নিয়েছি।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এসব কথা থাক। আপনাকে এখন এক কাপ চা দেই হুজুর? অনেকক্ষণ হলো এসেছেন!

ঃ দেবে? আচ্ছা দাও।

গেদু মিয়া চা বানিয়ে এনে টেবিলে দিলে, চায়ে চুমুক দিতে দিতে মুসাফির সাহেব হাল্কা কণ্ঠে বললেন– তা কি ব্যাপার গেদু মিয়া? ব্যবসাপাতিতে তোমার ভাটা পড়ে গেল নাকি? কোন খদ্দেরপাতি নেই! দোকান যে তোমার একদম ঢন ঢন?

সঙ্গে সঙ্গে গেদু মিয়া সোচ্চারকণ্ঠে বললো– থাকপেনানি হুজুর, ঢন ঢন আর বেশিক্ষণ থাকপেনানি। স্কুলের ছুটি হতে এখনো অনেকক্ষণ সময় বাকি আছে তো, তাই কেউ আসেনি। একটু অপেক্ষা করেন। দেখবেন দোকান আমার ভরে গেছে খদ্দেরে। মৌমাছিরা এসে সব চাকে বসে গেছে।

দু'চোখ প্রসারিত করে মুসাফির সাহেব বললেন– মানেটা তো ঠিক বুঝলাম না?

ঃ বুঝলেন না? এই জন্যই আপনাকে সাধু বাবা বলি আমি। কোন দিকেই নজর নেই আপনার। চোখ তুলে কোন কিছুই দেখেন না। স্কুল ছুটি হলে কিছু বড় বড় ছাত্রী আর ঠোঁটে রঙ লাগানো এক ঝাঁক ম্যাডাম আমার এই টীস্টলের সামনে দিয়ে দল বেঁধে যায়, দেখেন না? সুন্দরী সুন্দরী ম্যাডামরা তো কতদিন আপনার সামনে দিয়েই গেল আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো আপনাকে।

ঃ সুন্দরী সুন্দরী ম্যাডাম?

ঃ হ্যাঁ। আসলে না হোক, অধিকাংশই সাজ-পোশাকে সুন্দরী। আগে এমন রঙ মাখানো সাজগোজ যাত্রাদলে দেখতাম। এখন এসব হর হামেশাই পথেঘাটে দেখা যায়। দেখেন না কি হররোজ? অন্তত এখানে এসে দেখেন না মাঝে মাঝে?

ঃ না, আমি ওসব লক্ষ্য করিনে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

ঃ তাতেই সব হয়েছে। আপনি দুনিয়াদারীর বাইরের একজন পীর-দরবেশ মানুষ। কিন্তু সবাই তো তা নয়। সুন্দরী মেয়েমানুষের মুখ দেখতে মরা মানুষও নাকি মরার আগে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে তবে মরে। জ্যান্ত মানুষ তা দেখার জন্যে এখানে আসবে না?

ঃ গেদু মিয়া, তোমার মুখের লাগামটা কিন্তু ঢিলে হয়ে যাচ্ছে।

ঃ হবেই তো হুজুর। সত্যি কথা বলার সময় মুখে লাগাম থাকলে তা বলা যায় না ঠিক ঠিক।

ঃ বটে। তাতে লাভ? তা দেখে লাভ কি হয় তাদের?

ঃ নগদটা হলো চোখের ক্ষুধা মেটানো আর বাকিটা হলো ভবিষ্যতের জন্য কিছু আশা পোষণ করা। অবশ্য ভবিষ্যতের আশা সবাই পোষণ করে না, কিছু বদলোকেরা করে।

ঃ ভবিষ্যতের আশা? কি আশা?

www.boighar.com

গেদু মিয়া এবার কিছুটা বিরক্তির সাথে বললো– না হুজুর, আপনি কিছুই বোঝেন না। লাইন লাগানোর আশা আবার কি? লাইন লাগানোর মানেটাও যদি না বোঝেন, একাব্বর আলী মিয়াকে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নেবেন। একাব্বর মিয়া এ ব্যাপারে উস্তাদ ব্যক্তি। এ ব্যাপারে আমার এলেম খুবই কম।

ঃ একাব্বর মিয়া! সে আবার কে?

ঃ এই পাড়ার মাতবরের ছোট ভাই। হাড় বদমায়েশ। ঘরে দুই দুইটে বউ বর্তমান। ছেড়ে দিয়েছে এর আগে একটাকে। তবু তার শাদির নেশা যায়নি। আরো শাদি করার তার বেজায় সখ। ঐ নেশাতেই রোজ এখানে এসে ঘুরঘুর করে একাব্বর মিয়া। ইদানীং দেখি এক ম্যাডামের দিকেই নজরটা তার আটকে গেছে একদম।

ঃ সেকি। এসবকে তোমরা প্রশ্রয় দাও কেন? প্রতিবাদ করো না কেন কেউ তোমরা?

ঃ কি করে প্রতিবাদ করবো হুজুর? কেউ কি কারো মনের কথা সরাসরি প্রকাশ করে। আকারে-ইঙ্গিতে বুঝা যায়। মনের মতলব মনে নিয়ে এখানে বসে চা খায়। প্রতিবাদ করবেন কি?

ঃ আচ্ছা।

ঃ চায়ের স্টলে বসে চা খাবে লোকজন, এটা তো দোষের নয়। তাদের নজর যদি সেখান থেকে অন্যদিকে যায়, সেটা ছাঁদবেন কি করে? যাবেই। চায়ের স্টল থেকে হোক, দোকান-পাট থেকে হোক, কলকারখানা-অফিস-আদালত যেখান থেকেই হোক, মানুষের নজর বাইরে যাবেই। তাই বলে কি পথ দিয়ে মেয়েছেলেরা হাঁটবে না। ওরাও তাকাবে, এরাও হাঁটবে, এটা রোধ করার উপায় নেই। বরং এইটেই নিয়ম।

ঃ অর্থাৎ লেট দি ডগ্‌স বার্ক্ এ্যান্ড ক্যারাভ্যান গো সাইলেন্টলী।

ঃ হুজুর।

ঃ এটা একটা ইংরেজি কথা। তবে এক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে, এইজন্যেই ইসলামে বোরকার কথা আছে। বালেগ হওয়ামাত্র সুন্দরী-অসুন্দরী সব মেয়েকেই বাইরে আসারকালে বোরকা পরাটা অবশ্য কর্তব্য করা আছে। তা তারা পারে না বলেই খারাপ লোকের নজর তাদের ওপর পড়ে আর সমাজে নানা অঘটন ঘটে।

ঠিক এই সময় আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা এক মেয়েছেলে ছুটির কিছু আগেই বেরিয়ে এলো স্কুল থেকে এবং গেদু মিয়ার দোকানের সামনে দিয়ে ধীরপদে যেতে লাগলো। তা দেখেই গেদু মিয়া বললো– ঐ যে দেখুন হুজুর, আর না হোক, এই ম্যাডামটা কিন্তু আপনার কথা রেখেছেন। মানে, ইসলামের নির্দেশ ঠিক ঠিক মেনে চলছেন। একভাবে হাঁটছেন, কোনদিকে চাইছেন না।

সেদিকে তাকিয়ে মুসাফির সাহেব বললেন– আলহামদুলিল্লাহ। এই তো সঠিক আচরণ। সঠিক আদব-আখলাক। ইনি একজন ম্যাডাম না কি বললে?

ঃ জি হুজুর, জেরিনা ম্যাডাম।

ত্বরিত বেগে মাথা তুলে মুসাফির সাহেব বললেন– কি ম্যাডাম? জেরিনা ম্যাডাম নাকি?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জি হুজুর, জি।

ঃ তুমি কি করে চিনলে?

ঃ বাহ, চিনবো না কেন হুজুর? গাঁয়ের মেয়ে, ঐ মীর মোতাহার হোসেন সাহেবের নাতনি। আমি চিনবো না?

আরো আগ্রহী হয়ে ওঠে মুসাফির সাহেব প্রশ্ন করলেন, তুমি তাকে কি দেখেছো, মানে বোরকা খোলা অবস্থায়?

ঃ না-না, আমি তা দেখিনি। অন্যেরা যারা দেখেছে, তাদের বলতে শুনেছি। এই স্কুলের অন্য ম্যাডামরা তো আর পর্দা আব্রু করে না। এক সাথে যাওয়ার সময় তাঁদেরও এঁকে এই নামে ডাকতে শুনি। ইনার নাম পরিচয় নিয়ে আলাপ করতে শুনি। প্রতিদিন দেখে দেখে ঐ বোরকাটা আর হাঁটাটাও চিনতে পারি আমি।

ঃ গেদু মিয়া।

ঃ এঁকে আরো চিনিয়ে দিয়েছে ঐ একাব্বর আলী মিয়া। এই মেয়েটার উপরই এখন নজর পড়েছে তার।

ঃ বলো কি!

ঃ খুবই সুন্দরী মেয়ে হুজুর। যেসব মেয়েরা তাকে খোলা অবস্থায় দেখেছে তারা সবাই বলে, এতবড় সুন্দরী মেয়ে নাকি এই নূরপুরে আর নেই। এমন খবর শুনলে, একাব্বরের মতো চরিত্রহীনের মাথা কি আর ঠিক থাকে, বলুন?

মুসাফির সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন– কিন্তু মীর সাহেবের নাতনিই যদি হন ইনি, তাহলে তো ইনি বিবাহিতা মহিলা। কিছুটা বয়সী মহিলাও বটেন। দশ বছরের একটা বাচ্চা আছে এ মহিলার। এর দিকে ঐ একাব্বর আলী নজর দেয় কিভাবে?

ঃ কি যে বলেন হুজুর। চরিত্রহীনদের কাছে কোন ভাব অভাব আছে। সুন্দরী মেয়ে মানুষের কথায় তারা তো নেচে উঠবেই। একাব্বর আলীও তাই উঠেছে।

ঃ কিন্তু হিসাবটাতো মিলছে না। বিবাহিতা মেয়েকে.....

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে গেদু মিয়া বললো– সোজা হিসাব হুজুর। হঠাৎ হামলা করে বিশ্রী রকমের একটা হৈচৈ ঘটালেই স্বামী তাঁকে তালাক দেবে আর তাঁকে নিকাহ করবে একাব্বর।

ঃ না-না, এ হিসেব সোজা হলো কি করে? মীর সাহেবের মতো এমন একজন নামিদামি মানুষের নাতনির উপর হামলা করে কি সহজেই পার পাবে একাব্বর, না মীর সাহেব তাকে সহজে ছাড়বেন?

শেষের দিকে এদের কথাবার্তা খুব উচ্চ হয়ে উঠেছিল। মুসাফির সাহেব বেখেয়ালেই শেষের এই কথাটা খুব উচ্চকণ্ঠেই বললেন। ঐ মেয়েটি, অর্থাৎ জেরিনা ম্যাডাম এখনও অধিক দূরে যাননি। সবেমাত্র সদর সড়কের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। এই কথাগুলো খুব সম্ভব কানে পড়লো তাঁর। আর একারণেই

বোধ করি তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন হঠাৎ। তাঁকে দাঁড়াতে দেখেই হুঁশে এলেন এঁরা আর বন্ধ করলেন কথাবার্তা। সেকেন্ড কয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার পথচলা শুরু করলেন ভদ্র মহিলা।

কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন এদিক সেদিক বেড়িয়ে গেদু মিয়ার দোকানে চা খেতে আসতে কিছুটা দেরি হলো মুসাফির সাহেবের। স্কুলের তখন ছুটি হয়ে গেছে। ছাত্রীরা প্রায় সবাই চলে গেছে। দু'চারজন জটলা করছে মেইন গেটে দাঁড়িয়ে। শিক্ষিকারাও চলে গেছেন কয়েকজন। কয়েকজন বেরিয়ে এসেছেন যাওয়ার জন্য। এইমাত্র মেইন গেট পেরিয়ে এলেন তাঁরা। একজন একা একাই চলে এসেছেন মেইন রাস্তায়, অর্থাৎ ঐ কাঁচা সড়কের কাছাকাছি। ইনি জেরিনা ম্যাডাম। বরাবরের মতো তাঁর আপাদমস্তক বোরকার দ্বারা আবৃত। তাঁর বোধ হয় তাড়া ছিল কিছুটা। তাই তিনি দ্রুতপদে হাঁটছেন মাটির দিকে তাকিয়ে। বলাবাহুল্য, গেদু মিয়ার চায়ের দোকান তখন লোকে লোকারণ্য। খদ্দেরের উপচে পড়া ভিড়। কেউ চা খাচ্ছে বসে বসে, কেউ গল্প করছে দাঁড়িয়ে। একাব্বর আলী মিয়াও যথাযথই এসেছে। সে টি-স্টলের দুয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে কেবলই উঁকিঝুঁকি মারছে। উল্লেখ্য যে, এই খদ্দেরেরা সকলেই একাব্বর আলীর মতো চান্স সন্ধানী নন। স্কুলের ছুটির সময় হিসেব করে চা খেতে সবাই আসেননি। এই শেষবেলায় অধিকাংশই এসেছেন নিছকই চা খেতে আর চা খাওয়ার জন্যই।

এদিকে এই সময়ই চায়ের দোকানে তড়িঘড়ি আসতে লাগলেন মুসাফির সাহেব। অসময় হয়ে গেছে তাঁর। আসরের নামায সন্নিকট। কাজী বাড়ির ওয়াক্তিয়া মসজিদে গিয়ে জামাত ধরতে হবে তাঁকে। তিনিই সে জামাতের ইমাম। তাই কোনদিকে না চেয়ে তিনিও মাথা নিচু করে দ্রুতপদে আসছিলেন। বড় রাস্তা, অর্থাৎ বড় সড়ক ত্যাগ করে গেদু মিয়ার দোকানের পথ ধরতেই তিনি একদম জেরিনা ম্যাডামের মুখোমুখি হয়ে গেলেন। জেরিনা ম্যাডামও এই সময় এসে ঐ সড়কে নামবো নামবো করছিলেন। তাঁরও খেয়াল ছিল না কোন দিকে। ফলে, দু'জনই দু'জনের মুখোমুখী হয়ে গেলেন। এতটাই মুখোমুখি যে, দু'জনের মাঝখানে হাত দেড়েকের অধিক ফাঁক ছিলনা। চমকে উঠে দু'জনই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন নিজ নিজ স্থানে। পরক্ষণেই 'সরি' বলে মুসাফির সাহেব একপাশে একদম সরে এলেন। সরে এসে টি-স্টলের দিকে পা বাড়িয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। গলা ঝেড়ে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে জেরিনা ম্যাডামকে বললেন– **কসুর নেবেন না। ইউসুফ আলী কি আপনার ছেলে?**

ঐভাবেই বড় রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থেকে জেরিনা ম্যাডাম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ আমারই বৈ কি? কেন বলুন তো?

মুসাফির সাহেব স্মিত কণ্ঠে কললেন– সে আমারই কাছে দীনি এলেম শিক্ষা করতে আসে তো, তাই। শোনামাত্রই মুসাফির সাহেবের দিকে বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন জেরিনা ম্যাডাম। শশব্যস্তে হাত তুলে বললেন- আস্সালামু আলাইকুম।

মুসাফির সাহেব সালামের জবাব দিতেই জেরিনা ম্যাডাম ফের প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন– সে কি! আপনিই সেই মুসাফির সাহেব! কসুর নেবেন না, আমি চিনতে পারিনি; তাই কিছুটা বেয়াদবি হয়ে গেল।

ঃ না-না, কসুর কোথায়?

ঃ আমার কি খোশনসিব, আজকেই আমি দেখা পেলাম আপনার। মানে, আপনার সাথে এই প্রথম সাক্ষাৎ হলো আমার । কত সুনাম আপনার ইউসুফের মুখে শুনি।

ঃ ইউসুফ আলী বড়ই ভাল ছেলে। খুবই সৎ ছেলে। পড়াশুনাতেও খুবই মনোযোগী।

ঃ দোআ করবেন ও যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারে। আপনার মতোই ওর যেন খ্যাতি ছড়ায় চারদিকে।

এর বেশি কথা এদের এগুতে পারলো না। ইতোমধ্যেই বোম ফাটা শুরু হলো গেদু মিয়ার চায়ের দোকানের দুয়ারে। সেখান থেকে একাব্বর আলী হুংকার ছেড়ে বলতে লাগলো, আরে এই এই এই ব্যাটা মুসাফির, এই ব্যাটা আজিজুল হক, হকগিরি ছুটায়ে দেবো তোমার। একদম বেহক বানিয়ে ছাড়বো তোমাকে। বেয়াদপ বেআক্কেল, কি হচ্ছে ওসব?

জেরিনা ও মুসাফির সাহেব সবিস্ময়ে সে দিকে তাকাতেই একাব্বর আলী ফের বিকৃত কণ্ঠে বললো– ইহ! গাঁয়ের যোগী ভিখ্ পায়না, বাইরের যোগীর আবদার। কি হচ্ছে ওসব? কি আরম্ভ করেছো তুমি ওখানে? দূর হও, দূর হও ওখান থেকে।

তার চিৎকারে স্টলের ভেতরের লোকজন বিরক্ত হয়ে উঠলেন। একজন রুষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন- চেঁচাচ্ছো কেন? কি হচ্ছে? কোথায় কি হচ্ছে?

এর জবাবে একাব্বর আলী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো– কোথায় কি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো না? রাস্তায় আটকিয়ে গাঁয়ের এক সম্মানী মহিলার মানসম্মান হানী করছে বাইরের এক বদমায়েশ, তা চোখে পড়ছে না কারো?

ভেতর থেকে যিনি কথা বলছিলেন– তিনি একজন প্রভাবশালী লোক। উপস্থিত লোকদের অনেকেই তাঁর খুবই অনুগত। তিনি এবার ধমক দিয়ে বললেন- থামো। কাকে যাতা বলছো? উনি কে, তাকি জানো? চেনো উনাকে?

একাব্বর আলী তাচ্ছিল্যের সাথে বললো- চিনি-চিনি, খুব চিনি । সুন্দরী দেখলেই পথে-ঘাটে যে মেয়েছেলের ওপর হামলা করে, সে বদমায়েশই নয় শুধু,

সে চরিত্রহীন লম্পট।

গর্জে উঠলেন ভেতরের ঐ ভদ্রলোক। বিপুল রোষে বললেন-খামুশ! এতবড় স্পর্ধা ! নিজে একজন জঘন্য আর মার্কামারা লম্পট হয়ে সজ্জনকে লম্পট বলো তুমি।

কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে একাব্বর আলী ঐ একইভাবে বললো-লম্পট-লম্পট, একশোবার লম্পট।

আর যায় কোথায়। ক্ষেপে গেল ভেতরের তামাম লোকজন। সমস্বরে বলে উঠলো- মার, মার শালাকে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় হুজুরকে বলে বদমায়েশ আর লম্পট। দে শালার মুখ ভেঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ঘুষি বাগিয়ে নিয়ে ছুটে এলো একাব্বরের দিকে। এবার ভ্রুক্ষেপ করতেই হলো একাব্বরকে। বেগতিক দেখে সে তৎক্ষণাৎ স্টলের দুয়ার থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়ের উপর পালিয়ে যেতে লাগলো আর চিৎকার করে বলতে লাগলো- শুধু লম্পটই নয়, ও ব্যাটা নির্ঘাৎ একজন ফেরারি আসামি। নির্ঘাৎ ডাকাতি বা খুন করে এখানে এসে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। থানায় খবর দিলেই বেরিয়ে পড়বে সব–

"তবেরে" বলে কয়েকজন তাড়া করে এলে, "ওরে বাপরে" বলে একাব্বর আলী পড়িমরি পালিয়ে গেল তাড়া-খাওয়া শেয়ালের মতো। এদিকের এই কাণ্ড দেখে যারপর নেই তাজ্জব হলেন মুসাফির সাহেব ও জেরিনা ম্যাডাম। আর কোনদিকে না চেয়ে জেরিনা ম্যাডাম তৎক্ষণাৎ সদর রাস্তায় নেমে এলেন এবং গৃহের পথ ধরলেন। কিছুক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে মুসাফির সাহেবও আর চা খেতে এলেন না। ওখান থেকেই ঘুরে তিনিও পথ ধরলেন কাজী বাড়ির।

পরের দিন ইউসুফ আলী পড়তে এসে মুসাফির সাহেবকে বললো– হুজুর আমার আম্মা আপনাকে একটা অনুরোধ করেছেন। যদি কসুর না নেন তো বলি।

সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে মুসাফির সাহেব বললেন– তোমার আম্মা? তোমার আম্মা অনুরোধ করেছেন আমাকে? কি অনুরোধ বলো?

ইউসুফ আলী বললো- আম্মাজান আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন আমাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে। আমাকে তাঁর সে দাওয়াত পৌঁছে দিতে বলেছেন।

ঃ তোমাদের বাড়িতে? মানে, মীর বাড়িতে?

ঃ জি হুজুর। যদি দয়া করে একবার যান, তাহলে আমার আম্মা বড়ই খুশি হবেন।

ঃ তাই? কিন্তু আমাকে হঠাৎ দাওয়াত করার উনার কারণ কি ঘটলো?

ঃ সেটা আমি বলতে পারবো না হুজুর। সেটা আমার আম্মাজান জানেন। তবে আপনাকে যাওয়ার জন্যে উনি বিশেষ করে বলেছেন হুজুর, খুবই জোর দিয়ে বলেছেন। যাবেন একবার আমাদের বাড়িতে?

মুসাফির সাহেব ইতস্তত করে বললেন- যাবো তো, কিন্তু যাই কি করে? তোমার আম্মার নানাজান তোমাদের বাড়ির মালিক। তাঁর তরফ থেকে কোন ডাক না এলে, সেরেফ তোমার আম্মার ডাকে যাওয়াটা কি ঠিক হবে আমার?

ঃ কেন হুজুর, ঠিক হবে না কেন? আমার আম্মার নানাজান তো এসব কিছুই করেন না। কাউকে দাওয়াত করা, কোন অনুষ্ঠান করা- এসব তো সবই আমার আম্মাজানই করেন। যাওয়া আপনার ঠিক হবে না কেন?

ঃ তাই নাকি?

ঃ আম্মাজান আপনাকে যেতে বলেছেন শুনলে আমার আম্মার নানাজান দেখবেন খুবই খুশি হবেন। তিনি কত নাম করেন আপনার।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আসুন হুজুর আজকেই বা আগামীকাল বিকেলে?

একটু চিন্তা করে মুসাফির সাহেব বললেন- ঠিক আছে, আগামীকাল বিকেলেই যাবো। তোমার আম্মাজানকে জানাবে, আগামীকাল আসরের নামাযের ঠিক পরেই গিয়ে হাজির হবো তোমাদের বাড়িতে।

ইউসুফ আলী খুশি হয়ে বললো– জি আচ্ছা হুজুর। জি আচ্ছা।

কথামতো পরের দিন আসরের নামাযের পরেই মীর সাহেবের বাড়িতে চলে এলেন মুসাফির সাহেব। আগে থেকেই বৈঠকখানার দুয়ার খুলে নিয়ে বসেছিলেন বাড়ির মালিক মীর মোতাহার হোসেন সাহেব। মুসাফির সাহেব বৈঠকখানার নিকটবর্তী হলে মীর সাহেব ডাক দিয়ে বললেন– কে? আপনি কি মুসাফির সাহেব? কাজী বাড়ির ইমাম সাহেব আপনি?

মুসাফির সাহেব বাইরে থেকে বললেন- জি-জি, আমিই। ইউসুফ আলীর আম্মা আমাকে-

মীর সাহেব খোশ কণ্ঠে বললেন– জানি-জানি, আর সেইজন্যেই তো আপনার অপেক্ষায় আমি এখানে বসে আছি। চোখে ভাল দেখতে পাইনে বলেই আপনি কিনা সেটা যাচাই করে নিলাম। আসুন-আসুন, সোজা ভেতরে চলে আসুন।

বৈঠকখানার ভেতরে এসে মুসাফির সাহেব মীর সাহেবকে সালাম দিয়ে বললেন– সেকি! আপনি আমার অপেক্ষায় বসে আছেন?

সালামের জবাব দিয়ে মীর সাহেব বললেন– থাকতেই হবে। আমার নাতনির মুখে যখন শুনলাম আপনি আজ বাদ আসর আসবেন, তখন কি আর অপেক্ষায় না থেকে পারি? বাড়িতে মানুষ আমার খুবই কম। ইউসুফ আলী কেন যেন ইস্কুল থেকে এখনও ফেরেনি। আপনার মতো লোক এসে বাড়িতে কাউকে না দেখে ফিরে গেলে কি বেয়াদবির কোন সীমা থাকবে আমাদের? গুনাহগার হতেও কি কমতি থাকবে কিছু? দাঁড়িয়ে কেন? বসুন-বসুন।

বসার আসনের প্রতি ইঙ্গিত করলেন মীর সাহেব। মুসাফির সাহেব আসন গ্রহণ করলে মীর সাহেব নিজেও বসে পড়লেন অপর একটি আসনে। বসতে বসতে বললেন– আমার কি খোশ-নসিব! আপনার মতো একজন বিখ্যাত আলেম মানুষ আজ আমার বাড়িতে এলেন। www.boighar.com

মুসাফির সাহেব বাধা দিয়ে বললেন– এহহে! এতক্ষণে তো সত্যি সত্যিই গুনাহ্‌গার করলেন আমাকে। মোটেই কোন বিখ্যাত আলেম আমি নই। আমার আগমনে আপনার মতো এমন একজন প্রবীণ ব্যক্তির এতটা বিহ্বল হওয়ার আর নিজেকে এতটা ধন্য মনে করার আদৌ কোন কারণ নেই। বরং আমারই আজ চরম খোশ কিসমতি যে আপনার মতো এমন একজন প্রবীণ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির নিবিড় সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হলো আমার। আপনার নাতনি আমাকে ডেকে না পাঠালে হয়তো এমন কিসমত আমার কোনদিনই হতো না।

মীর সাহেব উৎসাহভরে বললেন– পাঠাবেই তো পাঠাবেই তো! আমার নতনির কথা বলছেন? সে এক আজব মেয়ে। আলেম-উলেমার সন্ধান পেলে, সে কি আর চুপ থাকে? সে যে উলামায়ে কেরামদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ইউসুফ আলীর মুখে আপনার সুখ্যাতি শোনার পর থেকেই তো সে আমাকে চাপ দিতেই আছে আপনাকে দাওয়াত করে আনার জন্যে। অচল মানুষ আমি। চোখেও ভাল দেখিনে। যাই-যাই করতে করতে এবার ইউসুফ আলীর মাধ্যমেই সে দাওয়াত করে এনেছে আপনাকে। ঠিকই করেছে। আমার আশায় থাকলে হয়তো আরো কতদিন কেটে যেতো, কে জানে!

মুসাফির সাহেব হেসে বললেন– তাই নাকি? আলেমদের প্রতি উনি খুবই শ্রদ্ধাশীল ?

মীর সাহেব বললেন– শ্রদ্ধাশীলই তো। খাঁটি আলেমদের প্রতি সত্যিই সে শ্রদ্ধাশীল। অপরদিকে, আলেম নামধারী ভণ্ড আর অসৎ ব্যক্তিরা তার দুই চোখের বিষ।

ঃ খুবই স্বাভাবিক। কিছু অসাধু মানুষ আলেমের ভেক নিয়ে ব্যবসা করে বেড়ায়। এলেম এদের সামান্য। ঈমান এদের নড়বড়ে। এদের উল্টাপাল্টা কথায় আর আচরণে মানুষের মনে আলেমদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। এতে করে আলেম সমাজ ও ইসলামের প্রভূত ক্ষতি হয়।

ঃ ক্ষতি বলে ক্ষতি। এদের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি হয়, একজন বিধর্মীর দ্বারা বোধ করি তার অর্ধেকটাও হয় না।

ক্রমেই দু'জন গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর মুসাফির সাহেব সংবিতে ফিরে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– ওহো, সময় তো আমার খুবই খাটো হয়ে এলো। আপনার নাতনি কোথায়? হঠাৎ উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন, তাতো জানা হলো না। আর তো আমি বেশিক্ষণ থাকতে

পারব না এখানে। মীর সাহেবও হুঁশে এসে বললেন– তাইতো-তাইতো। আপনার অপেক্ষায় আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে গিয়ে সে এতক্ষণ করে কী? আচ্ছা একটু বসুন, আমি দেখি।

বলেই লাঠিতে ভর দিয়ে মীর সাহেব যথাসম্ভব দ্রুত অন্দরের দিকে রওনা হলেন। মীর সাহেব বেরিয়ে যাওয়ার দুই-তিন মিনিট পরেই চা-নাশতার ট্রে হাতে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন জেরিনা ম্যাডাম। তাঁর আপদমস্তক ঐ একইভাবে বোরকায় আবৃত। সালাম দিয়ে চা-নাস্তার ট্রেটা মুসাফির সাহেবের সামনে টেবিলে রাখতে রাখতে জেরিনা ম্যাডাম সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বললেন– আমি দুঃখিত। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

সালামের জবাব দিয়ে মুসাফির সাহেব বললেন– একটু নয়, অনেকখানিই হয়ে গেল। আমার সময়টাই তো ফুরিয়ে এলো প্রায়। কেন আমাকে ডেকেছেন, চটপট বলুন তো এবার?

ঐ একই রকম মৃদুকণ্ঠে জেরিনা ম্যাডাম বললেন– ডাকিনি তো। এই একটু চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছি আপনাকে।

ঃ সেরেফ চা খাওয়ার জন্যেই দাওয়াত করেছেন আমাকে?

ঃ হ্যাঁ, অনেকটা তাই। তবে গত পরশুর ঐ ঘটনার জন্যে আপনি যেন মন খারাপ না করেন, এ কথাটা বলার জন্যেও এনেছি আপনাকে এখানে।

ঃ গত পরশুর ঘটনা বলতে গেদু মিয়ার চায়ের স্টলের সামনে ঐ এক বদমায়েশের চিৎকারের কথা বলছেন কি? ঐ ডাক-হাঁক, হুটপাট?

ঃ জি-জি, ঐ টাই।

ঃ তা এতে আমি মন খারাপ করবো কেন?

ঃ করতেই পারেন। আপনি ভিনদেশী লোক। ভাবতে পারেন, ঐ বদমায়েশের মতো এখানকার সব লোকই খারাপ। তাছাড়া, আমি যেখানে ঘটনার সাথে জড়িত, আমার সম্বন্ধেও আপনার মনে একটা বিরূপ ধারণা পয়দা হতে পারে।

ঃ বিরূপ ধারণা। অর্থাৎ?

ঃ আমি ভাল মেয়ে নই, এমন একটা ধারণা আর কি।

মুসাফির সাহেব প্রতিবাদী কণ্ঠে বললেন– না-না, তা হবে কেন? একি বলছেন? আপনাকে কখনো আমি খাটো করে ভাবিনে। বরং ইউসুফ আলীর আম্মা আপনি। আপনাকে আমি বরাবরই যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখি। আর এখানকার লোকজন যে খারাপ নয়, তা তো দেখতেই পেলাম সকলের আচরণে। আমাকে মন্দ কথা বলায় কীভাবে লোকজন তাড়া করলো ঐ শয়তানটাকে, তাতো আপনিও দেখলেন।

মৃদুকণ্ঠে হলেও জেরিনা ম্যাডাম এবার ঈষৎ হেসে বললেন– যাক, আপনি আমাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করলেন। কিছু দুষ্ট লোক সব এলাকাতেই থাকে, বুঝলেন।

তাদের কথায় অযথা মনখারাপ করবেন না বা এই এলাকার উপরও বিরূপ হবেন না। এইটুকুই নিবেদন করার ছিল আমার।

ঃ আরে না-না, এত পাতলা দিলের লোক আমি নই।

ঃ বেশ-বেশ। তা আপনার নামটা কি আজিজুল হক?

ঃ জি-জি। মুহম্মদ আজিজুল হক। আপনি কি করে জানলেন?

ঃ ঐ যে ঐ বদমায়েশটা আপনাকে সেদিন ঐ নামেই একবার ডাকলো বলে মনে হলো?

ঃ ও আচ্ছা। সেটাও খেয়াল আছে আপনার?

ঃ আছেই তো। তা আমার নামটা জানেন কি?

ঃ হ্যাঁ, জানি বৈকি। আপনি তো জেরিনা ম্যাডাম।

ঃ শুধু জেরিনাই নই। জাহানারা বেগম জেরিনা।

ঃ জি-জি, তাও জানি।

একদৃষ্টে পলকখানেক চেয়ে থাকার পর জেরিনা ম্যাডাম বললেন– তাও জানেন?

ঃ জানি বৈ কি।

ঃ বেশ-বেশ। খুবই ভাল কথা।

এরপরেই জেরিনা ম্যাডাম ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন আরে, চা-টাতো ঠাণ্ডা হতে চললো। নিন-নিন, জলদি নাশতাটুকু মুখে দিয়ে চায়ে চুমক দিন। ভিন্ন এককাপ বানিয়ে আনার সময়টা তো দেবেন না আপনি।

চমকে উঠে মুসাফির সাহেব বললেন– ওরে বাপরে। সে সময় আমার মোটেই নেই।

বলেই তাড়াহুড়া করে তিনি নাশতা খাওয়া শুরু করলেন। অল্প একটু নাশতা খেয়েই তিনি মুখ লাগালেন চায়ের কাপে। ইতোমধ্যেই মীর সাহেব ফিরে এলেন সেখানে। এসেই তিনি তাঁর নাতনিকে বললেন– কৈরে, কি জন্যে উনাকে ডেকেছিলে, সে সব কথাবার্তা বলা কি শেষ হয়েছে?

জেরিনা ম্যাডাম ঐ আগের মতোই মৃদুকণ্ঠে বললেন– জি নানাজান, হয়েছে।

ঃ কৈ, কিছুই তো কানে পড়ল না আমার? একটা প্রয়োজনে আমি ঐ বাইরের বারান্দাতেই তো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম?

এবার জবাব দিলেন মুসাফির সাহেব। বললেন– কি করে কানে পড়বে জনাব? যে লজ্জাবতী নাতনি আপনার, কথা বলেন অত্যন্ত নিচু গলায়। কাছে থেকেই শুনতে পাওয়া দায়, দূরে থেকে শুনবেন আপনি কি করে?

মাথা নিচু করে হাসতে লাগলেন জেরিনা ম্যাডাম। মীর সাহেব সহাস্যে বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, নাতনি আমার খুবই লজ্জাবতী।

মুসাফির সাহেব চা খাওয়াও এরই মধ্যে শেষ করলেন। এরপর ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– যাই আমি, আর দেরি করলে জামাত ধরতে পারব না।

বলেই আর এক দফা সালাম বিনিময় করে দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়লেন মুসাফির সাহেব।

চার.

একটার পর একটা কেটে যাচ্ছে দিন। সেদিনের ঐ ঘটনার পরে একাব্বর আলী গেদু মিয়ার টি-স্টলে আর কয়েকদিন আসেনি। মুসাফির সাহেব আবার পূর্ববৎ প্রায়দিনই সে টি-স্টলে আসেন। চা খান আর গল্প করেন গেদু মিয়ার সাথে। জেরিনা ম্যাডামও ঐ পথে প্রতিদিনই যাতায়াত করেন স্কুলে। আর কোন অঘটন ঘটেনি।

তবে ইদানীং একটুখানি বদলে গেছে দৃশ্যপট। যাতায়াতের পথে টি-স্টলের ভেতরে বা বাইরে মুসাফির সাহেবকে হঠাৎ দেখতে পেলে, দূর থেকে হাত তুলে তাঁকে সালাম দেন জেরিনা ম্যাডাম। মুসাফির সাহেবও স্মিতহাস্যে হাত তুলে জবাব দেন সে সালামের। নীরব সালাম বিনিময়। কোন কথাবার্তা এদের মধ্যে হয় না। কারো দিকে কেউ এগিয়েও আসেন না বা এগিয়েও যান না। ওদিকে আবার, এমন ঘটনা নিত্যদিনের নয়। প্রায়দিনও ঘটে না। মাঝে মধ্যে ঘটে।

অনেকের নজর এড়ালেও, এ দৃশ্য গেদু মিয়ার নজর এড়ায় না। সেও নীরবেই লক্ষ্য করে এসব। উল্লেখ্য যে, গেদু মিয়া এখন মুসাফির সাহেবের খুবই অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। নিখাদ সরলতা ও সদাচরণের দ্বারা গেদু মিয়া জয় করেছে মুসাফির সাহেবের হৃদয়। উভয়ের সম্পর্ক এখন অনেকটাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক। লঘু গুরু অনেক আলাপই এখন উভয়ের মধ্যে চলে।

তাই, কৌতূহলী গেদু মিয়ার এ দৃশ্যের এই নীরব দর্শকের ভূমিকা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কৌতূহলের বাঁধ তার ভেঙে গেল অল্পদিনেই। একদিন এঁদের মধ্যে এই সালাম বিনিময় লক্ষ্য করে গেদু মিয়া মুসাফির সাহেবকে সহাস্যে প্রশ্ন করলো– হুজুর, এক ধাক্কাতেই কেল্লা আপনি ফতে করে ফেললেন?

এ প্রশ্নের মাথা-মুণ্ডু মুসাফির সাহেব কিছুই বুঝলেন না। সবিস্ময়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন– তার অর্থ?

গেদু মিয়া বললো– অর্থটা হলো হুজুর, একাব্বর আলী বৎসরকাল যাবৎ কোশেশ করেও যে ডাল'টা গলাতে পারলো না, আপনি একদিনের আলাপেই সে ডাল'টা গলিয়ে একদম পানি বরাবর করে দিলেন?

মুসাফির সাহেব ফের বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন– কি বলতে চাও, তা খোলাসা করে বলো তো গেদু মিয়া? এত হেঁয়ালি করছো কেন?

গেদু মিয়া সরবে বললো– বলছি ঐ জেরিনা ম্যাডামের সাথে হঠাৎ আপনার এত পরিচয় হলো কি করে হুজুর? সেদিনের ঐ ঘটনার জন্যেই নয় কি? মুসাফি-

ফর সাহেব থামলেন। পরে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন– না।

গেদু মিয়া ফের বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো না? 'না' মানে কি হুজুর? ঐ ম্যাডামকে তো আগে কোনদিন দেখেননি। জানতেন নাও তাঁর কথা। তাহলে এই ভাবটা জমলো কী করে?

মুসাফির সাহেব এবার একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– দেখিনি, অর্থাৎ তাঁর মুখোমুখি হয়নি ঠিকই, কিন্তু তাঁর কথা জানা ছিল অনেকখানি। তবে মুখোমুখি হওয়াটা ঐ দিনের ঐ ঘটনা থেকেই শুরু এটা বলতে পারো।

আবার বিস্মিত হলো গেদু মিয়া। বললো– শুরু কি হুজুর? এরপরেও কি তাহলে আবার তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলেন আপনি?

ঃ হ্যাঁ, হয়েছি।

ঃ হয়েছেন! সেকি! কোথায় হুজুর?

ঃ তাঁর বাড়িতে। তিনি আমাকে চা এর দাওয়াত দিয়েছিলেন।

ঃ চা খাওয়ার দাওয়াত? মাশাআল্লাহ। তাঁর বাড়িতে চা খাওয়ার দাওয়াত তিনিই আপনাকে করেছিলেন?

ঃ জি, তিনিই আমাকে করেছিলেন।

ঃ গিয়েছিলেন আপনি তাঁর বাড়িতে?

ঃ আরে হ্যাঁ, বললামই তো গিয়েছিলাম। নইলে আরেকবার তাঁর মুখোমুখি হলেম কী করে?

ঃ কী তাজ্জব! কী তাজ্জব! একদিনের ঐ এতটুকু পরিচয়ের সুবাদেই একদম চা খাওয়ার দাওয়াত?

ঃ না, শুধু ঐ একদিনের ঐ পরিচয়ই নয়, উনার নাম-পরিচয় আমি আগে থেকেই জানতাম।

ঃ সে কি! সেটাও জানতেন? কী করে হুজুর?

ঃ তাঁর ছেলে আমার কাছে পড়ে। অর্থাৎ দীনি এলেম শিক্ষা করে।

ঃ এই জেরিনা ম্যাডামের ছেলে হুজুর?

ঃ জি, উনারই ছেলে।

ঃ কবে থেকে হুজুর, কবে থেকে পড়ে?

ঃ অনেকদিন থেকেই। আমার এই নূরপুরে আসার কিছুদিন পরে থেকেই।

থপ্ করে পাশের টুলে বসে পড়লো গেদু মিয়া। বিপুল বিস্ময়ে বললো– মার ক্ষেরেশায় গুড়ের লালি। ঘটনাটা তলে তলে এত দূরের তাহলে? আর এ বিষয়ে একটা কথাও বলেননি আপনি এতদিন? না-না হুজুর, এটা খুব অন্যায়।

মুসাফির সাহেব বললেন–অন্যায় বলছো কেন? একটা ম্যাডামের ছেলে আমার কাছে পড়ে এটা কি তোমাকে বলার মতো জরুরি কোন কথা যে, না বলাটা অন্যায় হবে? আজ ঘটনাচক্রে তাঁর কথা উঠে পড়েছে বলেই এ কথাটা হচ্ছে।

স্থির নয়নে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর গেদু মিয়া নিঃশ্বাস ফেলে বললো– তাইতো বলি, তলে তলে বউ পিঠা খায়, এত পিঠা কোথায় পায়? সৎ-অসৎ কোন মানুষই এ যাবৎ যে ম্যাডামের দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে পারলো না, ম্যাডামটাও কোনদিন কারোদিকে চোখ তুলে তাকায় না, সেই ম্যাডাম হঠাৎ আপনার এমন ভক্ত হলো কী করে? একদিনের ঐ একঝলক দৃষ্টি বিনিময়েই তো এতটা হওয়ার কথা নয়। এবার বুঝতে পারছি আসল মাহত্ম্যটা।

মুসাফির সাহেব মৃদু হেসে বললেন– পারছো? বেশ, তাহলে তা বুঝে নাও আর সেই তোমার কৌতূহলের রাশটা এবার টেনে ধরো।

গেদু মিয়া মাথা চুলকিয়ে বললো– টেনে ধরতে চাইলেই কি সব রাশ টেনে ধরা যায় হুজুর? এত সৎ আর সুন্দরী ম্যাডাম, তার সাথে আপনার এই বেশি বেশি পরিচয় মানে কথা হলো– কোন ভাবটাব তো জমে উঠেনি হুজুর?

ঃ ভাবটাব!

ঃ কসুর নেবেন না হুজুর! ঐ ম্যাডামটাকে কি পছন্দ হয়েছে আপনার?

মুসাফির সাহেব মৃদু উষ্মার সাথে বললেন– গেদু মিয়া।

গেদু মিয়া ভয়ে ভয়ে বললো– কসুরটা মাফ চেয়ে নিয়েই কিন্তু এটা জিজ্ঞাসা করেছি হুজুর। বেয়াদবি ধরলে এমন প্রশ্ন আর করবো না।

ঃ করাটা কি উচিত– তুমিই বিবেচনা করো।

ঃ তা হুজুর এ কথা বললে, ঠিকই আমার উচিত নয়। তবে খুবই আপত্তিকর প্রশ্নও তো এটাকে বলা যায় না হুজুর। মেয়েটাকে আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন করেছি। এমন দর্শনধারী মেয়ে, এত সুন্দর তাঁর আদব-আখলাক, তাঁকে পছন্দ হয় সকলেরই। আপনি পীর-দরবেশ মাফিক একজন সৎ-সাধু মানুষ। আপনার পছন্দ হয় কিনা এইটুকুই জানতে চেয়েছি মাত্র। এর বেশি কিছু নয়।

ঃ এইটুকুই মাত্র?

ঃ জি হুজুর, জি। এটা আমার নিছক একটা কৌতূহল মাত্র। জবাব দেয়া-নাদেয়া এটা আপনার ইচ্ছা হুজুর।

গেদু মিয়া মলিন মুখে মাথা নিচু করলো। তা দেখে মুসাফির সাহেব স্মিত হাস্যে বললেন– অমনি মন খারাপ হলো? এর জবাবটা যে দেয়া বড় কঠিন গেদু মিয়া। তোমার এই সোজা প্রশ্নের জবাবটা সোজা করে দেই আমি কি করে?

ঃ হুজুর!

ঃ মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয় কিনা– এর জবাবে 'হ্যাঁ' বললেও মিথ্যা বলা হবে, 'না' বললেও মিথ্যা বলা হবে।

ঃ বলেন কি হুজুর। এ কথার মানে?

ঃ মানেটা দিতে গেলেও ফের রেহাই দেবে না তুমি। আবার প্রশ্ন জাগবে তোমার মনে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ মেয়েটাকে পছন্দ হয়নি আমার, পছন্দ হয়েছে তাঁর নামটা। জাহানারা বেগম জেরিনা নামটা।

নিজের অজ্ঞাতেই গেদু মিয়া ফের প্রশ্ন করলো পছন্দ তাঁর নামটা? এ আবার কোন হেঁয়ালি হুজুর?

মুসাফির সাহেব নারাজ কণ্ঠে বললেন– ঐ যে বললাম, মানেটা বলে দিলে আবার তুমি প্রশ্ন করবে আমাকে। এটা কি তোমার ঠিক?

ঃ বেঠিকই বা হলো কি করে হুজুর? মেয়েটাকে পছন্দ নয়, তার নামটা আপনার পছন্দ, এ কথা শুনলে তো একটা পাগলেও প্রশ্ন করবে আপনাকে। জানতে চাইবে, এর কারণটা কী?

মুসাফির সাহেব নিঃশ্বাস চেপে বললেন– এই জন্যেই তো এ প্রসঙ্গে যেতে চাইনি আমি। তুমিই ঠেলে ঠেলে আমাকে নিয়ে এলে এদিকে। যা এসেছি, এই ঢের। এর বেশি আর এগুতে চাইনে। অর্থাৎ এর কারণটা আর বলতে চাইনে তোমাকে আমি।

ঃ হুজুর।

ঃ এর ব্যাখ্যা তোমাকে আমি দেবো না। তুমি এ কৌতূহল নিবারণ করো।

গেদু মিয়া সংযত কণ্ঠে বললো– জি হুজুর, জি-জি। করতে করতে অনেক কসুর করে ফেলেছি আমি। আর কসুর বাড়াবো না। আপনার এই অনিচ্ছুক কথা জানতে চাওয়ার মতো বেয়াদবি আর আমি করব না। এ কথা থাক হুজুর। আপনাকে চা দিই, চা খান।

ঃ হ্যাঁ, তা তো খাবোই। তবে এ নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না।

গেদু মিয়া সরবে বললো– না-না হুজুর তা করবো কেন? অনধিকার চর্চা করাটা তো আদৌ ঠিক নয়। আমার পক্ষে সেটা জব্বোর বেয়াদবি। এজন্যে আমি মন খারাপ করবো কেন?

ঃ অনধিকার চর্চা!

ঃ জি হুজুর, ব্যাপারটা তো তাই। কোথায় আপনি আর কোথায় আমি। আপনি নেহাতই একজন মহৎ আর নিরহঙ্কার মানুষ বলেই আমার মতো একজন গরিব আর অশিক্ষিত চা-ওয়ালার সাথে এত কথা বলেন আর এতসব গভীর আলাপ করেন। যে ধরনের আলাপ আপনি আমার সাথে করেন, এটা তো কখনোই আশা করতে পারিনে আমি। এর বেশি আশা করাটা তো আমার মস্তবড় গুনাহ হুজুর।

ঃ গেদু মিয়া!

ঃ না হুজুর, সমপর্যায়ের মানুষ ছাড়া এ প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা বলাই আপনার ঠিক নয়। মনে হচ্ছে, ঐ নামটার পেছনে কিছু রহস্য আছে। হয়তো এমন একটা

গল্প-কাহিনী আছে, কিছুটা হলেও তা নাজুক আর হয়তো সে আলাপ সকল পর্যায়ের লোকের সাথে করার মতো নয়।

মুসাফির সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– অর্থাৎ? কী বলতে চাও তুমি?

ঃ হুজুর সে রকম কিছু ব্যাপার হলে আমার সাথে তা নিয়ে আলাপ করা সত্যিই আপনার মানায় না। ওসব কথা থাক।

মুসাফির সাহেব সশব্দে বললেন– মানায়। একশো বার মানায়। সে আলাপ এ অঞ্চলে কারো সাথে করলে, একমাত্র তোমার সাথেই করা চলে আমার। সত্যিই এটা একটা মস্তবড় গল্প। আর এ গল্প একমাত্র তোমার সাথেই নির্দ্বিধায় করতে পারি আমি। আর কারো সাথে নয়।

ঃ হুজুর।

ঃ তুমি যে আমার খুবই বিশ্বস্ত লোক গেদু মিয়া। পছন্দের লোক। তোমার সাদা দিল আর পরিচ্ছন্ন মানসিকতার জন্যেই তোমাকে আমি বিশ্বাসও করি, ভালও বাসি। এ গল্পটা শোনানোর তোমার মতো যোগ্য লোক আসলেই এ যাবৎ কোথাও পাইনি আমি। একজন চা-ওয়ালা হলেও, এতদিনে সে লোক আমি তোমার মধ্যেই পেয়িছি। একমাত্র তোমার মধ্যেই।

ঃ হুজুর!

ঃ শুধু মরা কাহিনীটা নিয়ে ফের ঘাঁটাঘাঁটি করতে ইচ্ছে হয় না বলেই আমার এ আপত্তি।

ঃ মরা কাহিনী হুজুর!

ঃ চেপে রাখা কাহিনী। একটা ফালতু গল্পই বলতে পারো। তবু দীর্ঘকাল যাবৎ এই ফালতু গল্পটা মনের মধ্যে চেপে রেখে রেখে সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। দম বন্ধ হওয়ার পর্যায়ে এসেছে। তাই ইচ্ছে হয়, আর চেপে না রেখে কাউকে এ গল্পটা শুনিয়ে মনটা খানিকটা হাল্‌কা করে নিই।

অভিভূত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর গেদু মিয়া বললো– তাহলে বলুন না হুজুর সে গল্পটা। আমাকে শোনাতে যখন আপত্তি নেই আপনার, তাহলে বলুন না একটু শুনি।

ঃ শুনবে?

ঃ জি হুজুর, যদি মেহেরবানী করেন।

ঃ কিন্তু গল্পটাতো দু'এক কথার নয় গেদু মিয়া। মস্তবড় গল্প আর এটা শুনতে গোটা একটা প্রহর দরকার। এখনই শুনতে চাইলে তো এখনই বলা যাবে না সেটা।

ঃ হুজুর।

ঃ এক কাজ করো। যদি শুনতেই চাও, আগামীকাল শুক্রবার। শুক্রবারে তো দেখি স্টল তুমি বন্ধ রাখো। হয়তো খদ্দের হয় না বলেই তাই রাখো।

আগামীকাল শুক্রবার বিকেলে এসে স্টলটা খুলবে আর আমার অপেক্ষায় থাকবে তুমি। খদ্দের থাকবে না। সারাবেলা বসে দু'জন চুটিয়ে গল্প করবো নিরিবিলিতে।

গেদু মিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো– আপনি আসবেন হুজুর? সত্যিই?

ঃ হ্যাঁ আসবো। আসরের নামায আদায় করেই আসবো। অল্প সময়ে তো হবে না। আসর থেকে প্রায় এশাতক্ সময় লাগবে। মাগরিবের জামাতে ইমামতি করার জন্যে একজন কাউকে অনুরোধ করে রেখে আসরের নামাযের পরেই চলে আসবো আমি।

খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে গেদু মিয়া বললো– জি আচ্ছা হুজুর। তাই করবেন। আমি আমার টি-স্টল খুলে নিয়ে বসে থাকবো। তাহলে তাই আসবেন হুজুর। মেহেরবানী করে আসবেন।

তখনকার মতো বিদায় হয়ে চলে এলেন মুসাফির সাহেব। পরের দিন কথা মতো আসরের নামাযের পরেই গেদু মিয়ার স্টলে এসে হাজির হলেন তিনি। পরম আনন্দে গেদু মিয়া আগে এক কাপ চা বানালো মুসাফির সাহেবের জন্যে। চায়ের কাপ সামনে এগিয়ে দিয়ে সেও মুসাফির সাহেবের সামনে এস বসলো।

চুপচাপ বসে রইলো গেদু মিয়া। নীরবে চা পান শেষ করে মুসাফির সাহেব বললেন– তাহলে শোনো সে গল্প। বছর বারো আগের কথা। তারিখটা মনে নেই। পার্বতীপুর রেলওয়ে স্টেশনে খুলনাগামী ট্রেনে চেপে বসলো এক লোক। লোক মানে এক যুবক। সন্ধ্যা হয় হয়, এই ওয়াক্তে চলতে লাগলো ট্রেন।

কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় "পাঁঠাকেটে ভাগ দিন- পাঁঠাকেটে ভাগ দিন" রবে পার্বতীপুর থেকে ছুটে চলেছে খুলনাগামী ট্রেন। কোন এক বিহারী ছেলে জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে মুক্তকণ্ঠে গান গাইছে "ঝড় বাজাতি ছট্ ফট্ কারতি, হাওয়া মে উড়তি যাতা হ্যায়- ঝড় বাজাতি ছট্ ফট্ কারতি

খুব ছোট্ট একটা ইন্টারক্লাস কামরা। যে কারণেই হোক, ভিড়টা খুব কম ছিল। ঐ যুবকটিসহ আর মাত্র চারজন লোকছিল ঐ কামরায়। কিছুটা শিক্ষিত এক ছিমছাম মুরুব্বি ছিলেন ঐ অন্য চারজন লোকের মধ্যে। একই আসনে বসেছিলেন সবাই। হাত-পা ছড়িয়ে শাটপাট হয়ে শুয়ে পড়ার মতো ঐ একটাই বেঞ্চ ছিল ঐ কামরায়। পাশাপাশি বসে থাকতে থাকতে ঐ মুরুব্বি সাহেব যুবকটিকে প্রশ্ন করলেন– বাবাজিকে একজন মস্তবড় এলেমদার লোক মনে হচ্ছে। লেবাসটাও বেশ পুরোদস্তুর ইসলামী লেবাস। বাবাজির নামটা জানতে পারি কি? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।

www.boighar.com

জবাবে যুবকটি বললো– না-না, আপত্তি কি! আমার নাম আজিজুল হক। মুহম্মদ আজিজুল হক।

মুরুব্বি সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন বাবাজির যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

আজিজুল হক বললো– খুলনায় যাবো, এই ইরাদা নিয়ে বেরিয়েছি। এরপর সব আল্লাহ তাআলার ইচ্ছে।

মুরুব্বি সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– একদম খুলনায়? সেতো অনেক দূরের পথ। মানে, অনেক দূরের পাল্লা।

ঃ জি-জি। ওখানে পৌঁছতে সামনের এই গোটা রাতে কুলাবে না।

ঃ কি সাংঘাতিক! তাহলে এক কাজ করুন। আমরা সবাই এই সামনের স্টেশনে নেমে যাবো। আমরা নেমে গেলেই আপনি বেডিং বিছিয়ে সটান শুয়ে পড়বেন এই বেঞ্চে। কেউ উঠার আগেই শুয়ে পড়বেন। বাপরে বাপ। কত দূরের জার্নি।

আজিজুল হক ঈষৎ হেসে বললো– তাতেই কি রেহাই পাবো মুরুব্বি! কেউ উঠে পড়লে তো উঠতেই হবে আবার।

মুরুব্বি সাহেব বললেন– না-না, উঠবে না। এমনিতেই ভিড় আজ কম, তার উপর রাতের জার্নি। বেঞ্চে বেডিং বিছিয়ে একজন শুয়ে আছে দেখলে, এই ছোট কামরায় কেউ আর উঠবে না। তারাও তো শোয়ার জায়গা খুঁজবে। দূরের যাত্রী হলে, জরুর তা খুঁজবে।

সামনে স্টেশনটা এসে গেল। যুক্তিটা যত দুর্বলই হোক, মুরুব্বিসহ অন্য সবাই নেমে গেলে আজিজুল হক ঐ মুরুব্বির উপদেশটাই গ্রহণ করলো। সাথে তার একটা ব্যাগ আর পাতলা একটা বেডিং ছিল। বেডিংটা সঙ্গে সঙ্গে বিছিয়ে নিলো বেঞ্চে। এই স্টেশন থেকে আর কোন লোক উঠলো না দেখে সে আশ্বস্ত হলো। তার পরনে ছিল পায়জামা আর পাঞ্জাবি। অজুটাও ঠিক ছিল। মাগরিবের ওয়াক্ত যায় যায় দেখে সে আগে মাগরিবের নামায আদায় করলো এবং তারপরেই শাটপাট হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

চলতে লাগলো ট্রেন। রাতও ক্রমেই বাড়তে লাগলো। কামরায় সে একা। তাই নিরাপত্তার কারণে সে কামরার দরজাটা শক্ত করে বন্ধ করে দিল এবং ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়লো বিছানায়।

শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো আজিজুল হক। ঘুম যখন ভাঙলো রাত তখন দশটা। এশার নামায আদায় করা হয়নি তার। তাই সে বাথরুমে গিয়ে অজু করে এলো এবং এশার নামাযে বসে গেল। চার রাকাত সুন্নত পড়ে ফরজ নামাযে যেতেই সিটি বাজিয়ে গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে এলো। আজিজুল হক বুঝতে পারলো, সামনেই একটা স্টেশন আর গাড়ি সেখানে থামবে। নামাযের মধ্যে যাত্রীরা এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলে নামাযে ব্যাঘাত ঘটবে বুঝে, সে কামরার দরজাটা খুলে দিয়ে এলো এবং আবার নামাযে বসে গেল।

চার রাকাত ফরজ নামায শেষ করার পর দুই রাকাত সুন্নতের শেষ রাকাত শেষ করতেই, অর্থাৎ সালাম ফেরানোর আগেই ঘটে গেল সেই ব্যাঘাত। রক্ষে যে সালাম ফেরানোটুকুই বাকি ছিল শুধু।

কয়েকজন কুলির মাথায় লটবহর চাপিয়ে এক তরুণী বিপুল হৈ হল্লা সহকারে ঢুকে পড়লো আজিজুল হকের সেই কামরায়। পেছনে তার পঞ্চাশোত্তর বয়সের এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোটিকে কথা বলতে শোনা গেলো না তেমন, কিন্তু মেয়েটি একাই কাঁপিয়ে তুললো মেদিনী। কামরায় ঢুকে আজিজুল হককে নামাযরত দেখেই বিগড়ে গেল মেজাজ তার। চরম বিরক্তির সাথে বলে উঠলো– এখানেও মৌলবাদী? দেশটা রাজাকার আর মৌলবাদীতে ভরে গেল দেখছি। আরে এই; এই মিয়া, ছেড়ে দাও আসন। ইশ্! আবার বিছানা বিছিয়ে নিয়ে বসে আছে। সখ কত! গুটিয়ে নাও বিছানা। বিছানা গুটিয়ে নিয়ে জায়গা দাও আমাদের।

আজিজুল হক সালাম ফিরিয়ে সেদিকে তাকাতেই মেয়েটি ফের কুলিদের হুকুম দিলো দেখছো কি? মালপত্র বাংকের উপর তোলো সব চট্ পট্।

মাল তুলতে তুলতে কুলিরা বললো– সব মাল বোধ হয় বাংকে ধরবে না ম্যাডাম। কিছু মাল নিচে রাখতে হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণীটি তিরিক্কে কণ্ঠে বললো– নিচে মানে? অসম্ভব। একটা মালও নিচে রাখা চলবে না। যেভাবে হোক, ঐ বাংকেই সাজাও সব।

কুলিরা তাই করলো। আজিজুল হকের বড়োসড়ো ব্যাগটি নামিয়ে নিচে এক পাশে রাখলো এবং ঠেশেগুঁজে সব মাল বাংকেই তুলে দিলো। এরপর দাম নিয়ে কুলিরা বিদায় হলে তরুণীটি ফের নজর দিলো আজিজুল হকের ওপর। বললো– হ্যাঁ করে দেখছো কী? মেয়ে মানুষ কি কখনো দেখোনি? উঠো-উঠো, জায়গা ছেড়ে দাও।

কথাটা মিথ্যা নয় এমন মেয়ে আজিজুল হক কদাচিত দেখেছে। অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটি। প্রকৃত সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, এ মেয়েটি তাই-ই। দপ্ দপ্ করে জ্বলছে তার গায়ের রঙ। অপরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব। টানা টানা চোখ। খোদাই করা ঠোঁট। বিকশিত যৌবনের এক অপরূপ তরুণী। আজিজুল হক অবাক হয়ে দেখতে লাগলো তরুণীটিকে। কেবল তার রূপ-যৌবনই নয়, তরুণীটির লেবাস ও আচরণও। পরিধানে তার বস্ত্রের পরিমাণ খুবই কম। মাথার চুল অতিরিক্ত খাটো করে ছাঁটা। মাথা দেখলে পুরুষ বলে ভ্রম হয়। ডান হাতে ঘড়ি, চোখে গগল্স, ঠোঁটে আলতা, গলায় চেন, মেজাজ বাঘিনীকেও হার মানায়। এমন বৈচিত্র্যের সমাবেশ আজিজুল হক না দেখে আর পারে কি করে?

তরুণীটি পুনরায় সরোষে বললো– কি হলো? শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?

আজিজুল হক শান্ত কণ্ঠে বললো– জি হ্যাঁ, পাচ্ছি।

ঃ তাহলে আর বসে আছো কেন? উঠে পড়ো চটপট আর জায়গা দাও এই ভদ্রলোককে। একজন মুরুব্বি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাও না?

সঙ্গের ভদ্রলোকের দিকে ইঙ্গত করলো তরুণী। আজিজুল হক বললো– ঠিক আছে, উনাকে আমার এই বিছানাতেই এসে বসে পড়তে বলুন।

ঃ শুধু উনি কেন? আমারও তো জায়গা চাই।

ঃ বসুন, আপনিও উনার ওপাশে বসুন।

ঃ কী! আমি বসবো ঐ বিছানায়? ঐ অচ্ছুত বিছানায়? কোন রাজাকার-আলবদরের বিছানায় আমি বসিনে। উঠো উঠো-

ভদ্রলোকটি এবার মৃদু আপত্তি তুলে বললেন– আহা, এসব বলার কি দরকার আর এত চোটপাট করছিস কেন মা? উনাকে উঠার সময় দে। ধীরে সুস্থে কথা বল।

জবাবে মেয়েটি বললো– কী বললেন? ধীরে সুস্থে? দেখুন বাবা, এইসব অনগ্রসর মানুষদের আপনি চেনেন না। ভদ্রতার কি কোন মূল্য আছে এদের কাছে? নরম সুরে কথা বলবেন তো অমনি এরা শক্ত হয়ে যাবে। আপনার কোন কথাই আর শুনবে না।

এসব কথায় কান না দিয়ে আজিজুল হক গুটিয়ে নিলো বিছানা তার। আসনের এক প্রান্তে চেপে বসে তরুণীটিকে বললো– নিন আসুন। এবার বসুন আপনারা ঐ ধারে।

দুই চোখ গরম করে তরুণীটি বললো– আসবো মানে? তুমি উঠবে না আসন থেকে?

আজিজুল হক বললো– উঠতে হবে কেন? গোটা বেঞ্চটাই তো ছেড়ে দিয়েছি প্রায়। তিন চারজন মানুষ বসতে পারবে এখন। আপনাদের দু'জনের জায়গা হবে না?

তরুণীটি শক্তকণ্ঠে বললো– না, হবে না। উঠতে হবে তোমাকে।

ঃ তবু উঠতে হবে আমাকে? কেন বলুন তো? আমি থাকলে কি এক আসনে বসবেন না আপনারা?

ঃ না, বসবো না। তুমি উঠো।

ঃ সেকি! আপনারা কি তাহলে হিন্দু? মানে, কুলীন হিন্দু? কিন্তু কুলীন-অকুলীন যা-ই হোক, ট্রেনজার্নি করতে এতটা বাছ-বিচার তো কখনো দেখিনি। ছোঁয়া-ছুঁয়ির এমন প্রশ্ন কেউ তো তোলেনি। আপনারা কি একেবারেই নৈকষ্য কুলীন? মানে কুলীন বামুন?

ফের দুই চোখ গরম করে তরুণীটি রোষভরে বললো– খবরদার। ওসব বাজে কথা বলছো কেন? মতলব কী তোমার?

আজিজুল পূর্বপর শান্তকণ্ঠে বললো– না-না, মতলব কিছু নেই। আমি থাকলে আপনারা এ আসনে বসবেন না তো, তাই আপনাদের জাতটা জানতে চাচ্ছি।

তরুণী বললো– জাত মানে? আমরা মানুষ। মানুষের আর জাত কী?

ঃ তবু হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এমন কারো না কারো ঘরে তো জন্মেছেন আপনারা।

ঃ হ্যাঁ, জন্মেছি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানের ঘরে জন্মেছি আমরা।

এবার সঙ্গের ভদ্রলোটি, অর্থাৎ মহিলাটির পিতা কিছুটা বিরক্তির সাথে বললেন– আহ্! থামতো, থামতো মা জেরিনা। আয়, ওখানেই আপাতত বসি। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনে। জ্বরটা বুঝি আবার এলো।

এবার তরুণীটি, অর্থাৎ জেরিনা সাহেবা বেজায় ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– তবেরে! একজন অসুস্থ বৃদ্ধ লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তবুও নির্বিকার বসে আছো? অনগ্রসর মৌলবাদী হলেই কী মানুষ এতটাই অবিবেচক হয়?

চমকে উঠে আজিজুল হক বললো– অ্যাঁ সেকি। উনি অসুস্থ? আরে সে কথা তো বলবেন? এই যে আমি উঠে যাচ্ছি। দিন দিন, উনাকে শুইয়ে দিন এখানে। গুটানো বিছানাটা বগলদাবা করে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আজিজুল হক। দাঁড়িয়ে গিয়ে বললো– বিছানাপত্র আছে কিছু না আমারটা দেবো?

জেরিনা বিবি ঘৃণা ভরে বললো– তোমার বিছানা? ছোঃ!

ভদ্রলোকটি এবার কিছুটা লজ্জিত কণ্ঠে বললো– নারে বাপু, না। বিছানাপত্র আমাদের সাথেও আছে। তুমি যে জায়গাটা ছেড়ে দিলে, এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জ্বরটা হঠাৎ একটু বেড়ে গেল কিনা–

আজিজুল হক ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আহা, সত্যিই আমি দুঃখিত! আপনি অসুস্থ জানলে কি আর একদণ্ডও থাকতাম আমি ঐ আসন দখল করে? আপনার মেয়েই তো খামাখা হুম্‌কি-ধম্‌কি করে আমাকে বুঝতে দিলেন না কিছু।

ভদ্রলোকটি নিচু গলায় বললেন– ঐ রকমই বাপু! আমার মেয়ের মেজাজটা ঐ রকমই। বাপ হয়ে আমিই তাকে কন্ট্রোল করতে পারিনে, অন্যে পারবে কী?

বাংক থেকে বেডিং নামিয়ে জেরিনা বিবি বেঞ্চে বেডিং বিছাতে লাগলো। এই ফাঁকে আজিজুল হক প্রশ্ন করলো তা উনার নামটা কি জেরিনা বিবি?

বাপের কথাটা জেরিনা সাহেবা শুনেও শুনলো না। কিন্তু আজিজুল হকের কথায় সে ফুঁশে উঠে বললো– এই, জেরিনা বিবি কি? জেরিনা বিবি মানে? আমার নাম মিস্ জেরিনা। ব্যস্! খবরদার আমাকে ঐ বিবিটিবি বলবে না।

ঃ ও আচ্ছা। নামটা তাহলে মিস জেরিনা।

জেরিনার আব্বা বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই। জন্মের সময় জাহানারা বেগম জেরিনা এই নামটা রাখা হয়েছিল। কিন্তু ঐ জাহানারা বেগম নামটা সেকেলে হওয়ায় জেরিনা ওটা ব্যবহার করে না আর তাই আমরাও করিনে।

আজিজুল হক ফের প্রশ্ন করলো– তা জনাবের নামটা কি জানতে পারি? অবশ্য বেয়াদবি না নিলে।

ঃ না-না, বেয়াদবি কী? আমার নাম জাবেদ খান। মিঃ জাবেদ খান তোমার নাম?

ঃ আমার নাম আজিজুল হক। মুহম্মদ আজিজুল হক।

ঃ আজিজুল হক? বেশ-বেশ।

ইতোমধ্যেই জেরিনার বিছানা পাতা শেষ হয়েছিল। সে এবার তার পিতাকে ডাক দিয়ে বললো– আসুন বাবা, ফালতু বক বক না করে, আসুন, শুয়ে পড়ুন।

মিস্ জেরিনার পিতা, অর্থাৎ জাবেদ খান সাহেব নীরবে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। বিছানায় শুয়ে তিনি আজিজুল হককে বললেন– তা বাপু আমার পায়ের কাছে বসতে আপত্তি না থাকলে, তুমি এসে আমার পায়ের কাছে বসতে পারো। একজনের বসার মতো জায়গা সেখানে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো মিস্ জেরিনা। বললো– হোয়াট্! ও বসবে মানে? ও বসলে আমি বসবো কোথায়? আমি কি সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবো ট্রেনে?

হুঁশে এসে জাবেদ খান সাহেব হতাশ কণ্ঠে বললেন– ও হ্যাঁ, তাইতো তাইতো।

জেরিনা এসে তখনই তার পিতার পায়ের কাছে বসলো। আজিজুল হক বললো– আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আমার বেডিং আছে। আমি নিচেই মেঝেতে সেটা পেতে জায়গা করে নেবো। এছাড়া, তাহাজ্জুতের নামায পড়তে হবে। নিচেই আমার ভাল হবে।

ট্রেনটা তখনো স্টেশন ছেড়ে যায়নি। এই সময় "চা-গরম, চা-গরম" হাঁকতে হাঁকতে এক চা-ওয়ালা কামরার খোলা দরজার পাশ দিয়ে গেল। তা দেখে জাবেদ খান সাহেব মেয়েকে বললেন– গলাটা শুকিয়ে গেছে। এক পেয়ালা চা হলে মন্দ হতো না। এখন। দ্যাখ্তো মা, এক পেয়ালা চা পাওয়া যায় কিনা? চা-ওয়ালাকে ডাক দেতো।

জেরিনা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল দরজায় এবং বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাঁকতে লাগলো চা-ওয়ালা, এই চা-ওয়ালা, শুনো-শুনো। আরে ঐ চা-ওয়ালা।

চা-ওয়ালা তখন অনেক দূরে চলে গেছে। তার হাঁক চা-ওয়ালার কানে গিয়ে পৌঁছালো না। হতাশ হয়ে ফিরে এলো জেরিনা। ফিরে এসে পিতাকে বললো– না বাবা, চা-ওয়ালা চলে গেছে। চা পেতে হলে আমাকে নেমে যেতে হবে। তাই যাবো কি?

খান সাহেব সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন– না-না, তুই মেয়ে ছেলে,! তুই নেমে গিয়ে চা আনবি কোত্থেকে? তাছাড়া, ট্রেনটা যদি ইতোমধ্যে ছেড়ে দেয়।

জেরিনা বললো– কিন্তু চা খেতে চাইলেন আপনি–

খান সাহেব বললেন– কি আর করা যাবে। অদৃষ্টে না থাকলে, তুই করবি কী?

নিঃশ্বাস ফেললেন খান সাহেব। তা দেখে আজিজুল হক ইতস্তত বললো– তা বলছিলাম কি, আমি চা এনে দিলে আপনি কি তা খাবেন?

খান সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– খাবো মানে? খাবো না কেন?

আজিজুল হক টেনে টেনে বললো– না, কথা হলো আমি মুসলমান, মানে রাজাকার-মৌলবাদী এসব। আমার ছোঁয়া আপনারা খাবেন কিনা।

আজিজুল হক আড় চোখে জেরিনার দিকে তাকালো। খান সাহেব ক্লীষ্ট কণ্ঠে বললেন– একি উপহাস করছো বাপু তুমি? তোমার ছোঁয়া খাবো না মানে? ইসলাম অর্থাৎ কোন ধর্মটর্ম মানিনে ঠিকই, কিন্তু জন্মতো আমার মুসলমানের ঘরেই। তোমার ছোঁয়া খাবো না কেন?

ঃ তাহলে আমি যাই?

ঃ যাবে? কোথায়?

ঃ ট্রেন থেকে নেমে চায়ের খোঁজে। খোঁজ করলে নিশ্চয়ই চা পাওয়া যাবে। এতবড় স্টেশন।

ঃ তুমি যাবে?

ঃ অসুবিধে কী? আমি পুরুষ মানুষ। দ্রুত গিয়ে দ্রুত ফিরে আসবো।

ঃ কিন্তু এর মধ্যে ট্রেন যদি ছেড়ে দেয়।

ঃ তাতে কি! জোয়ান ছেলে আমি। এক দৌড়ে ফিরে আসতে পারবো। তবে চা কিন্তু মাটির পেয়ালায় হবে। কামরায় আনার জন্যে কাপ দেবে না কেউ।

ঃ সে তো বটেই। একান্তই যদি যাও, তাহলে ঐ মাটির পেয়ালাই ঢের। কিন্তু তুমি যাবে কেন?

ঃ কেনই বা যাবো না। আপনি অসুস্থ মানুষ। চা খাওয়ার আশা করে খেতে পাবেন না, তা কি করে হয়? সময় খাটো না করে আমি যাই। আপনারা আমার ব্যাগ আর বেডিংটা দেখবেন।

আজিজুল হক তার নিচে নামিয়ে রাখা বড়োসড়ো ব্যাগটার উপর বেডিংটা রেখে তৎক্ষণাৎ নেমে গেল ট্রেন থেকে। তা দেখে খান সাহেব তার কন্যাকে বললেন– ছেলেটাকে মোটামুটি ভালই বলে মনে হচ্ছে।

মিস্ জেরিনা তৎক্ষণাৎ ঠোঁট উল্টিয়ে বললো– ভাল না ছাই। এইসব কুপমণ্ডুক মৌলবাদীরা ভাল হয় কখনো?

জেরিনা ফের তার পিতার পায়ের কাছে বসলো এবং উভয়েই আজিজুল হকের ফিরে আসার পথ চেয়ে রইলো।

কিন্তু যা সন্দেহ করা হয়েছিল, তাই ঘটে গেল। আজিজুল হক নেমে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই ছেড়ে দিলো ট্রেন। ট্রেনটা নড়ে উঠলো দেখেই খান সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– সেকি! ট্রেন ছেড়ে দিলো নাকি?

জেরিনা বললো– হ্যাঁ, তাইতো দিলো।

খান সাহেব শুয়ে ছিলেন। দ্রুত উঠে বসে বললেন– বলিস কিরে। ফিরে এসেছে ছেলেটা? মানে তাকে দেখা যাচ্ছে নাকি, দ্যাখতো!

জেরিনা আবার দরজার কাছে এলো এবং উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলো। ট্রেন তখন দ্রুত চলতে শুরু করেছে। জেরিনা ফিরে এসে বললো– না, ওর কোন নাম-নিশানাও নেই কোথাও।

ঃ তার মানে। ছেলেটা ছাড়া পড়লো তাহলে? চেন টান চেন টান।

মিস্ জেরিনা রুষ্টকণ্ঠে বললো– কি বাজে কথা বলছেন? একজন জোয়ান মানুষ নেমে গেছে ফিরে আসেনি। এসব ফালতু কারণে চেন টানলে, জরিমানা থেকে রেহাই পাবেন ভেবেছেন?

ঃ তাহলে উপায়? হায়-হায়, ছেলেটা ছাড়াই পড়লো তাহলে?

জেরিনা বক্রকণ্ঠে বললো– ছাড়া পড়লো, না কেটে পড়লো, তাই বা কে বলবে? আপনার মানিব্যাগটা ঠিক আছে তো?

ঃ মানিব্যাগ! একি বলছিস্?

ঃ বলছি মানে, কামাইটা মনের মতো হলে কেটে পড়বে না কেন? কয় পয়সা দাম ঐ বেডিংএর আর কয় টাকার মাল আছে ঐ ব্যাগে? তোমার মানিব্যাগ আর ঘড়ি-আংটি ঠিক আছে কিনা, তাই আগে দেখো।

খান সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন– আহ্! তোর মাথাটা কি খারাপ হলো? ও লোকটা আমার কাছে এলো কখন যে আমার মানিব্যাগ আর ঘড়ি-আংটি নেবে? সব তো ঠিকই আছে। এইতো ঘড়ি-আংটি আমার বালিশের নিচে। আঙ্গুলটা জ্বালা করছে তাই আংটিটা খুলেছি।

ঃ ঠিক আছে? যাক বাঁচা গেল।

হাঁফ ছাড়লো মেয়েটা। কিন্তু খান সাহেব সখেদে বললেন– বাঁচা গেল কি বলছিস্? ঐ ছেলেটার কথা একটু ভাবতো দেখি? তার তো সব গেল। আমরা কোথায় যাচ্ছি তাও তাকে বলা হয়নি। তার এই ব্যাগবেডিং সে এখন কোথায় খুঁজে বেড়াবে? ব্যাগটায় মূল্যবান কিছু আছে কিনা, কে জানে। ইশ্। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক হয়ে গেল।

জেরিনার রোষ তবু পড়লো না। বললো– দুঃখজনক, না হাতি। যেমন বাহাদুরি দেখানোর সখ, তেমনি আক্কেল হয়েছে। এখন মাথা কুটুক প্লাটফরমে বসে বসে।

দুঃখিত মনে খান সাহেব ফের শুয়ে পড়লেন বিছানায়। মিস্ জেরিনা বসে বসে ট্রেনের গতির তালে তালে পা দোলাতে লাগলো।

অনেকক্ষণ ছোটার পর ট্রেন আবার পরবর্তী স্টেশনে এসে থামলো। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর আবার বাঁশি বেজে উঠলো ট্রেন ছাড়ার। আজিজুল হক ফিরে আসে কিনা, এই আশায় খান সাহেব উদগ্রীব হয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার

হুইসেল বাজার পরও এলো না দেখে নিরাশ হলেন তিনি।

দরজাটা খোলাই ছিল। চলার জন্যে ট্রেনটা হুঁশ্ হুঁশ্ করে উঠতেই, ছুটে এলো আজিজুল হক। তার দুই হাতে মাটির গ্লাসে দুই গ্লাস ধোঁয়া উঠা চা। কামরার দরজার কাছে এসেই সে জেরিনাকে লক্ষ্য করে বললো– ধরুন তো একটা গ্লাস, আমি উঠি।

আজিজুল হককে দেখতে পেয়ে খান সাহেব পরম আনন্দে উঠে বসলেন আবার। মেয়েকে বললেন– ধর ধর, ছেলেটা ফিরে এসেছে, দরজাটা মেলে ধর–

জেরিনা দরজার কাছে এলে আজিজুল হক ফের বললো- আমার দুই হাত বন্ধ। এই একটা গ্লাস ধরুন, আমি উঠি–

জেরিনা একটা গ্লাস হাতে নিলে, আজিজুল হক দ্রুত উঠে পড়লো ট্রেনে। ট্রেন তখন আবার চলতে শুরু করেছে। দুই গ্লাস গরম চা দেখে খান সাহেব সবিস্ময়ে বললেন- একি । দুই গ্লাস গরম চা। কোথায় পেলে চা আর এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?

আজিজুল হক বললো- ছিলাম ভিন্ন এক কামরায়। চা-ওয়ালা চা বানাতে দেরি করে ফেললো। তাই ট্রেন ছেড়ে দেয়ার পর দৌড়ায়ে আর কুলোতে পারলাম না। সামনে যে কামরাটা পেলাম, সেটাতেই উঠে পড়লাম।

খান সাহেব বললেন– বলো কি! তাহলে এখন আবার চা পেলে কোথায়া, এই গরম চা?

আজিজুল হক বললো– এবার ট্রেন থামতেই নেমে পড়লাম আর টি-স্টলে তাড়া দিয়ে ফের দুই গ্লাস চা বানিয়ে নিলাম। সহজে কি নেয়া যায় বানিয়ে? এবারও তো ট্রেনটা যায় যায় অবস্থা। নিন গরম থাকতেই চুমুক দিন চায়ে।

হাতের গ্লাসটা সে খান সাহেবকে দিলো। এবার জেরিনা তার হাতে ধরা গ্লাসটা আজিজুল হকের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো– এই নাও তোমার চা।

আজিজুল হক ব্যস্তকণ্ঠে বললো– না-না, আমি নেবো কেন? ওটা তো আপনার জন্যেই এনেছি। আপনাদের দু'জনের দু'গ্লাস।

চায়ে চুমুক দিয়ে খান সাহেব বললেন– তাহলে তোমার? তোমার কি চা খাওয়া হয়েছে?

ঃ হয়েছে-হয়েছে। এক সাথে দুই গ্লাস।

ঃ দুই গ্লাস কেমন?

ঃ আগের স্টেশনে দুই গ্লাস কিনে নিয়ে আসছিলাম তো। ট্রেন ছেড়ে দেয়ায় অন্য কামরায় উঠে পড়লাম। এতক্ষণ কি ঐ চা রাখা যায়, না গরম থাকে? পরপর দুই গ্লাসই খেয়ে নিলাম।

ঃ আচ্ছা। তাহলে চার গ্লাস চায়ের দাম দিয়েছো?

ঃ জি-জি–

বলেই আজিজুল হক জেরিনাকে লক্ষ্য করে বললো– আরে, তবু গ্লাসটা ধরে রইলেন কেন? চা তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নিন-নিন, চুমুক দিন জলদি-জলদি।

জেরিনা নারাজকণ্ঠে বললো– কেন, আমি খাবো কেন? আমি কি চা আনতে বলেছি তোমাকে?

আজিজুল হক বললো– কি যে বলেন ম্যাডাম। এটা কি বলতে হয়? দুইজন মানুষ আপনারা। চা আনতে গিয়ে একজনের জন্যে আনবো, আর একজনের জন্যে আনবো না এটা কি কোন কথা হলো? নিন, খেয়ে নিন।

জেরিনা তবু ইতস্তত করতে লাগলো। তা দেখে আজিজুল হক ফের বললো– নাকি আমি ছুঁয়েছি বলে আপত্তি আছে আপনার?

জবাবে জেরিনা রুষ্টকণ্ঠে বললো– খবরদার। ফোড়ন কাটবে না। আমি কি সে কথা বলেছি?

ঃ তাহলে খান চা-টা। অনর্থক ঠাণ্ডা করছেন কেন?

আর কথা না বলে জেরিনা তার সিটে গিয়ে বসলো এবং অন্য মুখ হয়ে মুখ লাগালো চায়ে।

নীরবে চা পান শেষ করলো দু'জন। শূন্য গ্লাসটা মেয়ের হাতে দিয়ে খান সাহেব বললেন– ফেলে দাও গ্লাস দুটো।

এরপর পকেটে হাত দিয়ে একখানা দশ টাকার নোট বের করে তিনি আজিজুল হককে বললেন– চার গ্লাসের দাম কত নিয়েছে জানিনে এই টাকাটা তুমি রাখো।

আজিজুল হক জোর আপত্তি তুলে বললো– সেকি। টাকা নেবো কেন? সামান্য এই চায়ের দাম কেউ কখনো নেয়, না নেয়া যায়?

জানালা দিয়ে গ্লাস দুটো ফেলে দিয়ে এসে জেরিনা বিবি বললো– তাহলে কি চা দু'গ্লাস খয়রাত করলে আমাদের? www.boighar.com

আজিজুল হক বললো– তওবা তওবা! একথা বলছেন কেন?

ঃ তা না হলে চায়ের দাম নেবে না কেন? কষ্ট করে আনলে, এই তো ঢের। দামটা না নিয়ে কি বড়লোকী দেখাতে চাও?

ঃ ছিঃ-ছিঃ! আমি নগণ্য মানুষ। আমি বড়লোকী দেখাবো কি?

ঃ তাহলে কথা না বাড়িয়ে টাকাটা নাও।

তার সাথে যোগ দিয়ে খান সাহেব বললেন– নাও বাবা, টাকাটা নাও। এ নিয়ে খামাখা বির্তকে যেও না।

ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে আজিজুল হক বললো– বেশ, নিতে যখন বাধ্য করছেন, তখন দিন টাকাটা।

দশ টাকার নোটটা নিয়ে পকেটে রাখলো এবং সেই সাথে আজিজুল হক পকেট থেকে বের করলো খুচরো ছয় টাকা। সেই টাকা সে খান সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো– নিন বাড়তিটা।

খান সাহেব সবিস্ময়ে বললেন– বাড়তি মানে?

আজিজুল হক বললো– গ্লাস সমেত প্রতি গ্লাসের দাম দুই টাকা। আপনাদের দুই গ্লাসের দাম লেগেছে চার টাকা। বাকি ছ'টাকা ফেরত নিন।

ঃ দুই গ্লাসের দাম কি রকম? তুমি তো আগেও দুই গ্লাস কিনেছিলে?

ঃ হ্যাঁ, কিনেছিলাম আর সেটা আমি খেয়েছি। সে দাম আপনি দেবেন কেন?

মিস্ জেরিনা বিরক্তির সাথে বললো– কি চুলচেরা হিসাব করতে লেগেছো? রাখো তোমার টাকা।

ঃ কেন ম্যাডাম? আপনারা বড় মানুষ। আপনারা যদি চুলচেরা হিসেবটা করতে পারেন, আমি পারব না কেন? আমি গরিব মানুষ বলে?

খান সাহেব বললেন– একি! এ আবার তুমি কি বলছো?

ঃ কেন বলবো না জনাব? বড়লোক আমি নই। কিন্তু তাই বলে এতটা কাঙাল আমি নই যে, সঙ্গী-যাত্রীদের জন্যে দু' পাঁচ টাকা খরচ করতে পারবো না। আপনারা এতটা আন্ডার এস্টিমেট করছেন কেন আমাকে?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ জোর করে দামটাও দেবেন আবার বাড়তিটা ফেরত নেবেন না এর অর্থ কি? বকশিশ দিচ্ছেন, না গরিব বলে করুণা করছেন? আমি কিন্তু বকশিশ, করুণা কোনটাই নেই না।

দুই চোখ বিস্ফারিত করে জাবেদ খান সাহেব বললেন– ওরে বাপরে! কি তুখোড় ছেলেরে বাবা। ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। আমার ঘা'ট হয়েছে। আমার দশটাকার নোটটা ফেরত দাও। চায়ের দাম নিতে হবে না তোমাকে।

ঃ মুরুব্বি!

ঃ সাব্বাস বেটা, সাব্বাস! কে বলে তুমি অজ্ঞ অনগ্রসর মানুষ।

আড়চোখে জেরিনার দিকে তাকিয়ে আজিজুল হক বললো– অনেকেই বলেন।

ঃ যারা বলে, অনগ্রসর তারা নিজেরাই।

জেরিনার মুখমণ্ডল লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। আজিজুল হক খান সাহেবকে খোশকণ্ঠে বললেন– আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি মুরুব্বি। ইসলাম না মানলেও আপনি কিন্তু আপনাদের দলের আর পাঁচজনের মতো নন।

দশটাকার নোটটা ফেরত নেয়ার পর নীরব হলেন খান সাহেব। আজিজুল হক বললো– আপনি এবার ঘুমোন মুরুব্বি। আমিও শোয়ার জায়গা করি। আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।

পাশ ফিরে শুতে শুতে খান সাহেব প্রশ্ন করলেন কোথায় যাবে তুমি?

ঃ যাত্রার প্রায় শেষ মাথায়। অর্থাৎ খুলনায়।

ঃ বলো কি! আমরাও তো ঐ দিকেই যাবো। মানে, খুলনারও ওপারে।

ঃ তাই নাকি? তাহলে আর অসুস্থ শরীর নিয়ে জেগে থাকবেন না অযথা। অনেক দূরের পাল্লা, এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।

অতঃপর মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো আজিজুল হক এবং অল্পক্ষণেই ঘুমে আবিষ্ট হলো। ঘুমিয়ে পড়লেন খান সাহেব। মিস্ জেরিনা বসে থেকে ঘুমের ঘোরে কেবলই ঢুলে ঢুলে পড়তে লাগলো।

অকস্মাৎ বিপর্যয়। শুধু বিপর্যয়ই নয়, মহা-বিপর্যয়। হঠাৎ লাইনচ্যুত হয়ে দুমড়ে-মুচড়ে নিচে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কি করে যেন লাইনচ্যুত কামরাগুলোতে আগুন ধরে গেল। আজিজুল হকদের কামরাটা লাইনচ্যুত হয়ে দুমড়ে-মুচড়ে কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আজিজুল হক তার বিছানা সমেত হেথা-হোথা দুই একটা ধাক্কা খেয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বাইরে এসে পড়লো। একই সাথে মিস্ জেরিনাও ছিটকে এসে পড়লো আজিজুল হকের গায়ের উপর। খান সাহেবও শায়িত অবস্থাতেই দ্রুত গড়াতে গড়াতে দরজার কাছে এলেন এবং কিছুটা হুঁশে এসে লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করতেই তাঁর একটা পা হাঁটু সমেত দুমড়ানো দরজার ফাঁকের মধ্যে আটকে যাওয়ায় তিনি পুরোপুরি বাইরে আসতে পারলেন না। হাঁটুটা তার আটকে রইলো দরজার সাথে এবং দেহটা তাঁর গোটাই বাদুর ঝোলা ঝুলতে লাগলো দরজার বাইরে এসে। এতে করে হাঁটুটা তাঁর ভেঙ্গে গেল পুরোপুরি এবং তিনি তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

কামরাটা দুমড়ে যাওয়ার ফলে বাংকের মালপত্র সব আটকে গেল বাংকে। একটা মালও গড়িয়ে পড়তে পারলো না। আজিজুল হকের ব্যাগটা কিছুটা গড়িয়ে এসে আটকে গেল কামরার ভেতর এবং তাতে আগুন ধরে গেল। সেই সাথে মালপত্রসহ কক্ষের সবকিছু দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো আগুনে।

অল্পবিস্তর ধাক্কা খেয়ে নিচে এসে পড়লেও আজিজুল হকও মিস্ জেরিনা তেমন আহত হলো না। হাতে-পায়ের ছাল বাকলাই অল্প কিছু উঠে গেলো মাত্র। পড়ে যাওয়ার পরে পরেই উঠে দাঁড়ালো তারা। জেরিনা বিবি ঝাড়তে লাগলো তার হাত-পা, আজিজুল হক তার বিছানাপত্রের আবেষ্টনী থেকে। নিজেকে মুক্ত করতে লাগলো কি দিয়ে কি হলো– এটা বুঝে উঠতে বিশ ত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগলো তাদের। এরপর তারা বুঝতে পারলো আসল ঘটনাটা। বুঝতে পারলো, ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে তারা। কক্ষময় আগুন দেখে আঁত্কে উঠলো দুইজনই। মিস জেরিনা তার পিতার খোঁজ করতেই পিতাকে সে দেখতে পেলো ঝুলন্ত অবস্থায়। দেখেই সে চিৎকার দিয়ে উঠলো। বলতে লাগলো–মারাগেল, আমার বাবা পুড়ে মারা গেল। বাঁচাও–বাঁচাও–

বলেই সে ছুটে গেল বাপের কাছে। বাপের দেহটা তুলে ধরে দরজার সাথে আটকে যাওয়া পা'টা খোলার চেষ্টা করলো। পা'টা আটকে ছিল শূন্যে। সে জায়গা তার নাগলের বাইরে হওয়ায় সে তখনই আজিজুল হকের শরণাপন্ন হলো

এবং তাকে কাতরকণ্ঠে বলতে লাগলো বাঁচাও, দোহাই তোমার, আমার বাবাকে বাঁচাও।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই আজিজুল হক লাফ দিয়ে কাত হয়ে থাকা কামরাটার দরজার উপর উঠলো। খান সাহেবের হাঁটুটা আটকে ছিল ভেঁজে যাওয়া পাল্লার ফাঁকের মধ্যে। পাল্লা ধরে প্রাণপণে টানাটানি করতেই বেরিয়ে এলো খান সাহেবের পা'টা। তাঁর দেহটা এবার মাটিতে পড়ে যেতেই নিচে থেকে তাঁকে ধরে ফেললো মিস্ জেরিনা।

এদিকে আগুনটা ইতোধ্যেই দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। দরজা দিয়ে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। আর একটু হলেই আগুন ধরতো আজিজুল হকের গায়ে। পা'টা বের হতে আর একটু দেরি হলেই পুড়ে যেতো খান সাহেবের পা'টাও। পা'টা বেরিয়ে আসতেই আজিজুল হক লাফ দিয়ে আবার নেমে এলো নিচে। এরপর জেরিনার সাথে ধরাধরি করে সজ্ঞাহীন খান সাহেবকে ঘটনাস্থল থেকে অনেকখানি ফাঁকে এনে সমতল স্থানে শুইয়ে দিলো।

খান সাহেবের ভাঙ্গা হাঁটু দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে অঝোরে। হাঁটুর ভাঙ্গা একটা চামড়া ভেদ করে অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে বাইরে। তা দেখে মিস্ জেরিনা নিদারুণ আর্তনাদ করতে লাগলো। ভদ্র লোকটির ওপর আজিজুল হকের অনেকখানি মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাঁর হাঁটুর ঐ অবস্থা দেখে সেও হায় হায় করতে লাগলো। এদের এই আহাজারি এক হয়ে মিশে গেল অদূরে লাইনচ্যুত অন্য কামরাগুলোর যাত্রীদের আহাজারির সাথে। অবশ্য খান সাহেবের এ অবস্থা দেখে, কোথায় কি হচ্ছে সেদিকে নজর দেয়ার কোন অবকাশ রইলো না জেরিনা বা আজিজুল হক কারোই। এখন তাদের করণীয় কি এই চিন্তায় তারা দিশেহারা হয়ে গেল।

ট্রেনের এই এ্যাক্সিডেন্টটা যেখানে ঘটলো সেটা অনেকটা একটা নির্জন প্রান্ত র। লাইনের দুই পাশে অজ পাড়াগাঁ। লোকবসতি অল্প এবং তাও সব কিছুটা দূরে দূরে। এ্যাক্সিডেন্টের শব্দে আর লোকজনের কোলাহলে নিকটবর্তী গাঁ থেকে কিছু লোক ছুটে আসতে লাগলো।

এদিকে খান সাহেবের হাঁটুর রক্তবন্ধ করার জন্য আজিজুল হক নেকড়া বা বস্ত্রখণ্ড খুঁজতে লাগলো। জেরিনার পরিধানে বস্ত্রের পরিমাণ এতটাই অল্প যে, সেখান থেকে বস্ত্রখণ্ড পাওয়ার কোন আশাই রইলো না। আজিজুল হক প্রথমে তার পকেট থেকে রুমাল বের করে বেঁধে দিল ক্ষতস্থান। কিন্তু ক্ষতটা এতই বড় আর রক্তের বেগ এতটাই বেশি যে, পাতলা ঐ রুমালে কুলালো না। আজিজুল হক অগত্যা ছিঁড়ে ফেললো তার বেডশিটের এক প্রান্ত। এবার এই মোটা ও বড় বস্ত্রখণ্ড দিয়ে খান সাহেবের হাঁটুটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে দিলো সে। এতে করে পলকখানেক রক্ত দেখা না গেলেও এর পরেই ঐ মোটা বাঁধন ভেদ করে রক্তের

ধারা চুইয়ে চুইয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো আবার। তা দেখে হতাশ হলো আজিজুল হক। আপন মনে বলে উঠলো আমার চেষ্টা শেষ। আর কি করতে পারি আমি?

শুনে রোদুদ্যমানা জেরিনা চমকে উঠে বললো– তাহলে? তাহলে এখন উপায়?

আজিজুল হক বললো– ডাক্তার প্রয়োজন। এক্ষুণি ইনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।

ঃ কোথায় পাবো ডাক্তার?

ঃ সেটা তো আমারও জানা নেই। আমি কি করে বলি?

ঃ তাহলে?

ঃ সেইটেই তো ভেবে কোন কূলকিনারা পাচ্ছিনে। এই নিধুয়া প্রান্তরে কোথায়ই বা যানবাহন আর কোথায়ই বা ডাক্তার, আমার মাথায় কিছুই ধরছে না।

ঃ না ধরলে হবে কি করে? আমার বাবাতো মারা যাবেন তাহলে?

ঃ সেটা আপনার নসিব। আমি আর কি করতে পারি, বলুন?

ফের ডুকরে উঠলো জেরিনা। মিনতি করে বললো– দোহাই আপনার। এভাবে হাল ছেড়ে দেবেন না। যা হয় একটা কিছু করুন ঝট্ পট্।

ঃ আমি করবো? আমি কি করবো?

ঃ সেটা আপনিই ভেবে বের করুন। অতীতে যে বেয়াদবি আপনার সাথে করেছি আমি, সেটা মাফ করে দিয়ে যা হয় কিছু করুন আপনি দয়া করে। আমি মেয়েছেলে। আমার ওপর এ দায়িত্ব ফেলে রেখে না গিয়ে, দয়া করে এ দায়িত্ব নিজে আপনি নিন আর যা করার তা করুন। এই দুঃসময়ে আমাকে একা ফেলে যাবেন না বা একা করে দেবেন না। দোহাই আপনার।

আজিজুল হক বললো– এ সময়ে একা করে দিতে তো আমিও চাইনে। কিন্তু-

পাশফিরে চেয়েই ফের সরবে বলে উঠলো আরে দাঁড়ান-দাঁড়ান। এই যে একজন বৃদ্ধ লোক এসে গেছেন এখানে। এর কাছে কিছু খোঁজ-খবর নিই–

ঘুরে দাঁড়ালো আজিজুল হক। লোকটাকে ডাক দিয়ে বললো– এই যে বাবাজি, দয়া করে একটু শুনুন তো?

লোকটি কাছে আসতেই আজিজুল হক ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললো– এখানে কি কোন ডাক্তার বা ডাক্তারখানা আছে?

লোকটি বললো– না, কাছে কোলে নেই। এখান থেকে মাইল দুই আড়াই দূরে একটা ছোট বাজার আছে। এক ডাক্তার এসে সেখানে একটা ক্লিনিক, মানে একটা ডাক্তারখানা খুলেছে। এই অল্পদিন হলো এসেছে ঐ ডাক্তার।

উৎসাহিত হয়ে উঠে আজিজুল হক বললো– আছে? ডাক্তারখানা আছে? তাহলে সেখানে যাওয়া যাবে কি করে?

লোকটি বললো– পায়ে হেঁটে। হাঁটতে না পারলে এই যে এই পাড়াতেই খান দুইয়েক ভ্যানগাড়ি আছে, কপালে থাকলে, তার একটা পেয়েও যেতে পারেন। পেলে ঐ ভ্যান গাড়িতে চড়ে যান।

অতি নিকটের কয়েকটা বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে লোকটি দ্রুত ট্রেনের কাছে চলে গেল। আজিজুল হকের কোন কথাতেই কান দিলো না আর। ট্রেনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তখন। ঐ আগুন দেখেতেই ছুটলো।

পলক খানেক উভয়েই নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর আজিজুল হক বললো– কি করবেন এখন? গেলে এখন ঐ ডাক্তারখানাতেই যেতে হবে।

মিস্ জেরিনা বললো– তাহলে তাই করুন। জলদি। বাবার জ্ঞান ফিরেনি এখনোও। ডাক্তারের কাছে না নিলে তো এইভাবেই মারা যেতে পারেন।

ঃ আল্লাহ না করুন, সে সম্ভাবনা তো এখন একশোভাগ বিদ্যমান। কিন্তু ডাক্তারের কাছে নিতে হলে ভ্যান-রিকশা যা হোক একটা কিছু আনা দরকার। এই পাড়াটাতে যাওয়া দরকার সেই খোঁজে। যাবেন কি সেখানে না আমাকেই যেতে হবে?

মিস্ জেরিনা অসহায় কণ্ঠে বললো– আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে এখানে বলুন? আমার উপর রাগটা আর ধরে রাখবেন কতক্ষণ? একে আমি মেয়েছেলে তার উপর বাবাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি এখান থেকে সরে যাই কি করে? আপনিই যান। দয়া করে জলদি জলদি যান।

ছিটিয়ে পড়া বিছানাটা ক্ষিপ্রহস্তে গুছিয়ে এনে জেরিনার কাছে রেখে আজিজুল হক ঐ পাড়াটার দিকে ছুটলো। দৌড়ের উপর সেখানে গিয়ে খুঁজতে লাগলো ভ্যান।

কপালটা প্রসন্নই ছিল। তাই অল্প খোঁজেই পেয়ে গেল ভ্যান একটা আর সেটা নিয়ে অতিদ্রুত ফিরে এলো আবার। অতঃপর তিনজনে ধরাধরি করে খান সাহেবকে ভ্যানের উপর তুললো আর সেই সাথে তারাও উঠে বসলো ভ্যানে। খান সাহেবের জ্ঞানটা ইতোমধ্যেই ফিরে এলো কিছুটা। জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি মৃদুকণ্ঠে কাতরাতে শুরু করলেন।

যথাসম্ভব দ্রুত চালিয়ে ভ্যানওয়ালা তাদের ঐ নির্দিষ্ট ডাক্তারখানায় নিয়ে এলো। রাত তখন প্রায় বারোটা। রুগীর কাতরানিটা তীব্র হচ্ছে ক্রমেই। নসিবগুণে ডাক্তারকেও এই সময় ডাক্তারখানায় পাওয়া গেল। ডাক্তারখানা বন্ধ করার উপক্রম করছিলেন তিনি। সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনে আর রুগীর অবস্থা দেখে ডাক্তার সাহেব বললেন– রুগীকে এখনই আমার ক্লিনিকে ভর্তি করতে হবে। কয়েকদিন রুগীকে রাখতে হবে এখানে। মারাত্মক ফ্র্যাকচার। এটাকে সারিয়ে

তুলতে সময় লাগবে বেশ কয়েকদিন। ক্লিনিকে ভর্তি করতে রাজি থাকলে নামিয়ে আনুন রুগীকে।

কোন কথার মধ্যে না থেকে মিস্ জেরিনা আর্তকণ্ঠে বললো– আমার বাবাকে আপনি বাঁচান ডাক্তার সাহেব। যা করার দরকার শিগগির শিগগির তাই করুন দয়া করে। তাঁর এ অবস্থা আমি আর সহ্য করতে পারিছিনে।

ডাক্তার সাহেব বললেন– তা আমি অবশ্যই করবো। কিন্তু এতে তো খরচ পড়বে কিছুটা। ট্রেন এ্যাকসিডেন্টে সবকিছু খুইয়ে এসেছেন, বলছেন। খরচের সে পয়সা-কড়ি আপনাদের সাথে আছে তো? এতবড় চিকিৎসা একেবারেই বিনে পয়সায় করা কিন্তু সম্ভব নয়।

এ কথায় মিস্ জেরিনা অসহায়ভাবে আজিজুল হকের মুখের দিকে তাকালো। রাত্রিকাল। মরণাপন্ন রুগী নিয়ে যাওয়ারও কোন জায়গা নেই। আশ্রয় তাদের চাই-ই। তাই আজিজুল হক তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে বললো– পয়সা-কড়ির ব্যাপার নিয়ে ভাববেন না। আপনার পাওনা অবশ্যই শোধ করবো আমরা। আপনি দয়া করে রুগীকে আগে বাঁচান।

ডাক্তার সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন– ওকে.। তাহলে নামিয়ে আনুন রুগী।

রুগীকে নামিয়ে প্রথমে ডাক্তারখানায় নেয়া হলো। হেলপারদের ডেকে ডাক্তার সাহেব রত হলেন চিকিৎসায়। অনেকক্ষণ ধরে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং ব্যান্ডেজ– আদি বাঁধার পর, ডাক্তার সাহেব রুগীকে স্ট্রেচারে করে এনে তাঁর ক্লিনিকের একটা কেবিনে শুইয়ে দিলেন। এরপর আজিজুল হকদের বললেন– রক্তপাত বন্ধ করা হয়েছে। সেই সাথে ঘুমের ওষুধও খাওয়ানো হয়েছে রুগীকে। খানিক পরেই ঘুমিয়ে যাবে রুগী। ঘুমিয়ে গেলে, এই কাতরানিটাও থেমে যাবে। শক্ত ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। আগামীকালে একপ্রহর বেলাতক ঘুমিয়ে থাকবে রুগী।

আজিজুল হক বললো– একপ্রহর বেলাতক?

ডাক্তার সাহেব বললেন– হ্যাঁ তাই থাকবে। রাত তো আর বেশি নেই। এই রাত্রিকালে যতটুকু সম্ভব তাই করা হলো। অর্থাৎ প্রাইমারি ট্রিটমেন্টটা করা হলো। কাল দিনের বেলা বাদ বাকিটা করা হবে। রুগী ঘুমিয়ে না যাওয়াতক রুগীর প্রতি আপনারা যথা সম্ভব খেয়াল রাখবেন।

নির্দেশাদি দিয়ে স্ট্রেচার ও লোকজন নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার সাহেব। জেরিনা ও আজিজুল হক এসে রুগীর বেডের কাছে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ কাতরানোর পরে সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে গেলেন খান সাহেব। ফলে বন্ধ হলো তার কাতরানি।

রাত প্রায় শেষের দিকে তখন। ক্লিনিকটি একটি সদ্য নির্মিত ক্লিনিক। কেবিনটাও তাই। আকারে অনেক ছোট। এই কেবিনটি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে

সাজানো হয়নি তখনও। রুগীর বেডটাই এনে স্থাপন করা হয়েছে মাত্র। এর বাইরে, বসার বা শোয়ার আর দ্বিতীয় কোন আসন এনে স্থাপন করা হয়নি। ওষুধপত্রের শিশি আর পানির জগ-গ্লাস রাখার জন্যে ছোট্ট একটা টেবিল রুগীর শিয়রে থাকলেও টেবিলটা এতই ছোট আর নড়বড়ে যে, ঐসব রাখা ছাড়া বসা বা শোয়ার জন্যে সেটা ব্যবহার করার উপায় নেই। বেডের পাশে এক চিলতে মেঝে। বসতে বা শুতে হলে, ব্যবহার করতে হবে ঐ মেঝেটাই।

দীর্ঘসময়ের ক্লান্তির পর ঘুমের আবেশ চেপে ধরলো জেরিনা ও আজিজুল হক দু'জনকেই। এ অবস্থায় আজিজুল হক জেরিনাকে বললো– এক কাজ করুন। আমি জেগে আছি, আপনি আমার এই বেডিংটা মেঝেতে বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। অনেক আহাজারি করেছেন। কিছুটা না ঘুমালে তো আপনিও রুগী হয়ে যাবেন।

জবাবে জেরিনা বললো– না-না, আমার কিছু হবে না। আপনিই শুয়ে পড়ুন।

ঃ হবে না মানে? আপনাদের আসার আগে পিছে আমি তবু কিছুটা ঘুমিয়েছি ট্রেনে। আপনি তো চোখের দুইপাতা এক করতে পারেননি। ঘুমের আবেশে বসে বসে কিছুক্ষণ ঝিমিয়েছেন মাত্র। না-না, ঘুমের দরকার আপনারই বেশি। আমি বিছানা বিছিয়ে দিচ্ছি, আপনি শুয়ে পড়ুন।

ঃ দরকার নেই দরকার নেই। আপনি শুয়ে পড়ুন তো। প্রয়োজনে মেয়েরা দুই একরাত জেগেই কাটাতে পারে।

ঃ আর পুরুষরা বুঝি তা পারে না? আসল কথা সেটা নয়। মৌলবাদীদের বিছানায় আপনি জীবনেও শোন না এইটেই হলো আসল কথা। না শুতে চাইলে জোর করবো না আমি।

আহত হলো জেরিনা। মৃদুকণ্ঠে আর্তনাদ করে বললো– আহারে! অপরাধ আমি অনেকখানিই করেছি, এটা ঠিক। অনেক অপ্রিয় কথা মূর্খের মতো না বুঝেই বলেছি। কিন্তু সে জন্যে তো খুবই অনুতপ্ত আমি আর মাফও চেয়েছি কয়েকবার। তবু আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েই চলেছেন কেন? কি করলে আমার ঐ অপরাধটা মাফ করবেন আপনি– দয়া করে বলুন তো?

কিছুটা সংকুচিত হয়ে আজিজুল হক বললো– আচ্ছা-আচ্ছা, ঠিক আছে ম্যাডাম। এ কথা আমি আর কখনো বলবো না। এ নিয়ে মন খারাপ করবেন না কাইন্ডলি।

ঃ মন খারাপ আমার হবে না, যদি আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়েন আপনি।

আজিজুল হক কথা আর বাড়ালো না। মেঝেতে বিছানাটা প্রশস্ত করে পেতে সে শুয়ে পড়লো শাটপাট এবং ঘুমিয়ে গেল অল্পক্ষণেই।

সকাল হয়ে গেছে। সূর্যটা আকাশে উঠে গেছে পুরোপুরি। তবুও ঘুমিয়েই আছে আজিজুল হক। আজান ধ্বনি, সূর্যের আলো, বাইরের সাড়াশব্দ– কিছুই তার কক্ষে আর তার কানে এসে পৌঁছেনি। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙ্গলো অভাবনীয়

এক ঘটনায়। ঘুমের ঘোরেই তার মনে হলো, কার যেন গোটা একটা বাহু এসে তার বুকের উপর পড়লো। এতেই ভেঙ্গে গেল ঘুমটা তার। এ অবস্থাতেই চোখ মেলে তাকিয়ে সে চমকে উঠলো। দেখলো, কখন যেন মিস্ জেরিনা এসে তার বিছানার একপ্রান্তে শুয়ে পড়েছে। ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে তার দিক হতেই জেরিনার বাহুটা গোটাটাই এসে পড়েছে তার বুকের উপর।

দেখেই শিউরে উঠলো আজিজুল হক। জেরিনা তখনও ঘুমে অচেতন। হৈচৈ করে উঠলে জেরিনার ঘুমটা ভেঙ্গে যাবে আর সে বেজায় শরম পাবে চিন্তা করে আজিজুল হক জেরিনার হাতখানা আস্তে করে নামিয়ে একপাশে রাখলো এবং সে নিঃশব্দে উঠে গেল বিছানা থেকে।

বিছানা থেকে উঠে আজিজুল হক আগে এ্যাটাচ্ড বাথরুমে ঢুকলো এবং অজু করে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে। ক্লিনিকটির বাইরের বারান্দায় গোটা দুই হেলনা বেঞ্চপাতা ছিল। আজিজুল হক এসে ঐ হেলনা বেঞ্চের একটাতে বসে ফজরের নামায আদায় করলো। এরপর আর কেবিনে ফিরে না গিয়ে সে একটু হাঁটাহাঁটি করার জন্যে আর চারপাশটা দেখার জন্যে বেরিয়ে এলো ক্লিনিকের বাইরে।

সূর্য তখন অনেকখানি উঠলেও বসতি-বিরল এই স্থানে লোকজন তেমন ছিল না। পাশের বাজারটায় দু'চারজনের কিছুটা সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছেমাত্র। বাজারের দিকে না গিয়ে ফাঁকা ময়দানে সে আপন মনে ঘুরে বেড়ালো অনেকক্ষণ। এরপর কেবিনে যখন ফিরে এলো তখন দেখলো, বেডিংটা তার পরিপাটি করে গুটানো। জেরিনা সেখানে নেই। বাথরুমে তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আজিজুল হককে দেখেই মিস্ জেরিনা শরমে জড়োসড়ো হয়ে গেল। অস্ফুটকণ্ঠে বললো– ছিঃ-ছিঃ। এটা আপনি কি করলেন? আপনার বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছি আমি– এটা তো দেখে ফেললেনই, তার উপর আবার আমাকে না জাগিয়ে দিয়েই উঠে গেলেন নীরবে?

আজিজুল হক মৃদুহাস্যে বললো– আমার যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন ঘুমে আপনি অচেতন। ও অবস্থায় কি জাগানো আপনাকে উচিত ছিল আমার? সারারাত জেগে থেকে সবে একটু ঘুমিয়েছেন–

ঃ ঘুমে আমি অচেতন ছিলাম?

ঃ ছিলেনই তো। আপনার একখানা হাত, মানে বাহুটা গোটাই এসে আমার গায়ের উপর পড়লো। তাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, কিন্তু আপনি একটুও নড়াচড়া করলেন না। আপনার বাহুটা নামিয়ে রেখে উঠে গেলাম, তবুও না। ঘুমে অচেতন না থাকলে কি ইচ্ছে করে ঐ অবস্থায় নীরব থাকতে পারেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে মুখ ঢেকে জেরিনা আবার লজ্জিতকণ্ঠে বলে উঠলো– ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! বলেন কি? এর মধ্যে এতকাণ্ডও ঘটে গেছে?

ঃ গেছেই তো। ঘুমের ঘোরে এমনটি তো ঘটতেই পারে।

ঃ ও-মাগো! এ লজ্জা আমি ঢাকি কি করে? ঘুমের চাপ সামাল দিতে না পেরে ভাবলাম, আপনার বিছানায় অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে, ওখানে শুয়ে চোখ একটু বুঁজি। খানিক পরেই, মানে আপনি জাগার আগেই আমি উঠে আসবো আবার। কিন্তু–

আজিজুল হক হেসে বললো– কিন্তু ঘুম আপনাকে সে মওকা দিলো না। দেবে কি করে? সারারাত ঘুমটাকে এড়িয়ে গেছেন আপনি। সুযোগ পেলে ঘুমটাতো জাপটে আপনাকে ধরবেই।

ঃ তাইতো দেখছি। তবে ভাগ্য আমার যথেষ্ট ভাল যে, ঘুমটাই কেবল জাপটে ধরেছে আমাকে, আর কেউ তা ধরেনি। এ অবস্থায় এমন রেহাই কেউ কোন দিন পায় বলে জানা নেই আমার। কপাল গুণে আমি তা পেলাম।

ঃ জি?

ঃ জাপটে ধরার এমন সুযোগও যে মানুষ ছাড়ে, এটা কখনো শুনিনি।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেই চমকে উঠলো আজিজুল হক। সক্রোধে বললো– কি বলছেন? কি বলতে চান আপনি?

কেবিন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে মিস্ জেরিনা হাসি চেপে বললো– কিছু না, কিছু না। ডাক্তার সাহেব এলেন কিনা, দেখে আসি।

তখনো ঘুমিয়েই ছিলেন রুগী জাবেদ খান সাহেব। কিছুক্ষণ পরে মিস্ জেরিনা ফিরে এলে আজিজুল হক প্রশ্ন করলো –কি দেখলেন? ডাক্তার সাহেব কি চেম্বারে এসেছেন?

জেরিনা বললো– না। অন্যদের দেখলাম, ডাক্তার সাহেবকে তো দেখলাম না।

আজিজুল হক বললো– ঠিক আছে। রুগীও ঘুমিয়ে আছেন, ডাক্তারের জন্যে ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।

আরো কিছুক্ষণ পরের কথা। আজিজুল হক গুটানো বিছানার উপর এককোণে বসে ছিল। জেরিনা দাঁড়িয়ে ছিল রুগীর কাছে। এই সময় ক্লিনিকের এক ঝি এসে জেরিনাকে বললো– – এইযে সাহেব, রুগীর ঘুম ভেঙ্গেছে কিনা, ডাক্তার সাহেব তা জানতে চাইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে মিস্ জেরিনা বললো– অ্যাঁ? ডাক্তার সাহেব এসেছেন?

জেরিনার মুখ দেখেই ঝি'টা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। নিজের অজ্ঞাতেই সে বলে উঠলো– ওমা! এতো মেয়ে ছেলে! আমি ভাবলাম পুরুষ মানুষ বুঝি। একি অবাক কাণ্ড! শহরের কোন বাউরে মেয়ে নাকি?

শেষের কথাটা ঝি কিছুটা নিম্নকণ্ঠে বললো– মিস্ জেরিনা রুষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করলো– কি বললে?

বইঘর.কম ও রোকন

ঝি বললো– না, কিছু না। রুগীর ঘুম ভাঙ্গলে ডাক্তার সাহেবকে জানাবেন।

জেরিনাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তখনই বেরিয়ে গেল ঝি। এতে জেরিনার মনের অবস্থা কেমন হলো তা বোঝা গেল না। আজিজুল হকের মুখটা এই সময় কেউ দেখলে সে বুঝতে পারতো, মর্মে মরে যাচ্ছে লোকটা।

রুগীর ঘুম ভাঙ্গলে নার্স- হেলপার সহকারে এসে ডাক্তার সাহেব রুগীর চিকিৎসার ব্যাপারে করণীয় যা বাকি ছিল তা করলেন। এরপর কয়েক শিশি ওষুধ রুগীর শিয়রে রেখে বললেন– রুগীর গায়ে আগে থেকেই জ্বর কিছুটা ছিল। এখন সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক খানি। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। এক ঘণ্টা পরপর এই ওষুধ পাল্টাপাল্টি খাওয়ালেই নেমে আসবে জ্বরটা আবার। তখন রুগীকে কিছু তরল খাবার দিতে হবে। অবশ্য, যা করার আমার নার্সেরাই সব করবে। আপনারা রুগীকে পাহারা দেবেন শুধু। আপনাদের করতে হবেনা কিছুই।

এরপর দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। ডাক্তারের পেছনে বেরিয়ে যেতে যেতে একজন হেলপার ঘুরে দাঁড়িয়ে আজিজুল হককে কটাক্ষ করে বললো– এটা কি আপনার ওয়াইফ, মানে ইস্ত্রি?

জেরিনার দিকে ইঙ্গিত করলো হেলপার। আজিজুল হক ক্রোধভরে "হোয়াট" বলে এগিয়ে এলে ফিক্ করে হেসে দ্রুত পালিয়ে গেল হেলপারটা।

এরপরেই বাইরে একটা হাসাহাসির শব্দ শোনা গেল। এই হাসাহাসির মধ্যে যে কথাটা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলো আজিজুল হক, সেটা হলো– "কি কাণ্ড-কি কাণ্ড! মৌলবির সাথে বাওরা মেয়ে! বে-আব্রু বেশরম মেয়ে!"

রুগীর অবস্থা এখন অপেক্ষাকৃত ভাল। তবে কাতরানিটা তাঁর একেবারেই থেমে যায়নি। জ্বরের আর ঘুমের ঘোরে কুনকুন্ করে তিনি কাতরাতেই আছেন থেকে থেকে।

সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে ডাক্তার সাহেব বেরিয়ে যাওয়ার কিছু পরে আজিজুল হক জেরিনাকে একপাশে ডেকে বললো– আমি এখন চলে যাই। রুগীর অবস্থাতো আল্লাহর রহমে এখন খানিকটা ভাল। ডাক্তার আছেন, নার্সেরা আছে, আমার থাকাটা তেমন জরুরি নয় এখন। আমি এবার চলে যাই।

শুনে মিস্ জেরিনা হতভম্ব হয়ে গেল। বিপুল বিস্ময়ে বললো– একি বলছেন আপনি! এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে আমাকে একা ফেলে রেখে আপনি চলে যাবেন মানে? আপনাকে এতকরে বলছি, "আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই এখন এখানে। আপনিই আমার একমাত্র অবলম্বন। আমার সম্বল, আমার ভরসা। সেই আপনি আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন– একথা পুনরায় ভাবতে পারছেন কি করে?"

আজিজুল হক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– আপনি এই উদ্ভট পোশাক, অর্থাৎ এই গেঞ্জি-প্যান্ট না ছাড়লে, আপনার সাথে থাকা আমার সম্ভব নয়। এই গেঞ্জি-

প্যান্ট পরে লজ্জার কোন দিকটা নিবারণ করেছেন আপনি? বরং সবদিকই তো মেলে ধরেছেন ফলাও করে। ওদিকে আবার মাথার মানান চুলটাও রাখেন নি।

মিস্ জেরিনা থতমত করে বললো– জি?

আজিজুল হক বললো– এটা পাড়াগাঁ। ইতোমধ্যে চারদিকে নানারকম গুঞ্জরণ শুরু হয়েছে আপনার এই পোশাক নিয়ে। এ অবস্থায় আপনার সাথে থাকতে আমি পারিনে। কারণ, আমার প্রেষ্টিজকেও আহত করছে এটা।

ঃ সেকি! তাহলে কি করতে বলছেন আমাকে?

ঃ আপনাকে এই পোশাক এখনই ছাড়তে হবে। তবেই আপনার সাথে থাকা আমার সম্ভব।

ঃ এই পোশাক ছেড়ে আমি তাহলে পরবো কি? আর তো কোন পোশাক নেই আমার কাছে।

ঃ এটা একটা বাজার। কাপড়-চোপড় নাকি সব রকমই পাওয়া যায় এখানে। আপনি বললেই– তা কিনে আনতে পারি।

ঃ আপনি কিনে আনবেন?

ঃ মাথাব্যথা যখন আমার, তখন আমাকেই তো কিনে আনতে হবে। আপনি এ পোশাক ছাড়তে রাজি কিনা, তাই বলুন?

জেরিনা বিমর্ষকণ্ঠে বললো– অগত্যা মধুসূদন! আপনি চাইছেন, আমি আর আপত্তি করি কি করে। আনুন কিনে তাহলে।

ঃ কি পোশাক আনবো, সেটাও বলুন? সালোয়ার-কামিজ-ওড়না, না সায়া-শাড়ি-ব্লাউজ।

মিস জেরিন ভীতকণ্ঠে বললো– ওরে বাপরে! হঠাৎ করে এতটা বদলাতে আমি পারবো না। আপনি শাড়ি-ব্লাউজ আর পেটিকোটই আনুন।

ঃ শাড়ি-ব্লাউজ, পেটিকোট? ঠিক আছে, আমি তাই আনছি। কিন্তু শাড়ি-ব্লাউজ পরে কপালে আবার টিপ পরবেন না যেন। তাহলে আবার সবাই আপনাকে হিন্দু মহিলা ভাববে। কোন হিন্দু মহিলার সাথেও থাকা আমার সম্ভব নয়।

ঃ ঠিক আছে– ঠিক আছে। কোন ফোঁটা-টিপও পরবো না। তাছাড়া, ওসব এখানে পাবোই বা কোথায়? আপনি যান–

খানিক পরেই বাজারে গেল আজিজুল হক। ফিরে যখন এলো, তখন তার এক হাতে মস্ত বড় কাপড়ের এক পোঁটলা, আর অন্য হাতে গুটানো এক মাদুর। পাতলা খাবার ও ওষুধ খাওয়ানোর পর খান সাহেব আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন ইতোমধ্যে। আজিজুলের হাতে ওসব দেখেই জেরিনা বাপের নিকট থেকে একটু দূরে সরে এলো এবং নিচু ও বিস্মিত কণ্ঠে বললো– একি! এতসব কি? এ মাদুরটা ফের কি হবে? ওটা কিনে আনলেন কেন?

আজিজুল হক বললো– এই মাদুরই আপনার বেড, মানে বিছানা। বিছানার চাদরও এনেছি একখানা। রেডিমেড বালিশ পাওয়া গেল না। আপনার এই প্যান্ট আর গেঞ্জি ভাঁজ করে গামছা দিয়ে জড়ালেই বালিশের কাজ হয়ে যাবে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ এই মেঝেতে বিছানা পেতে স্বাধীনভাবে ঘুমাবেন। ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়তে হবে না, আবার চুরি করে পরের বিছানায় শুতে যেতেও হবে না।

মিস্ জেরিনা চোখ পাকিয়ে বললো– বটে! ফের ঐ কথা?

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা, আর বলবো না।

ঃ আমি মেঝেতে বিছানা পাতলে আপনি কোথায় পাতবেন? আমার বিছানার পাশেই?

ঃ জিনা। কোন বেগানা মহিলার সাথে এক ঘরে শোয়ার মোটেই খাহেশ নেই আমার। বাইরের বারান্দার ঐ হেলনা বেঞ্চই আমার জন্যে যথেষ্ট। ওর উপর বিছানা পেতে দিব্বি ঘুমাতে পারবো আমি।

জেরিনা বললো– বেশ, সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এতবড় এই পোঁটলায় আর কি কি আছে? আমার শাড়ি ব্লাউজেই তো পোঁটলাটা এত বড় হবে না?

ঃ না। শাড়ি-ব্লাউজ ছাড়াও এর মধ্যে আমার একটা লুঙ্গি আছে। একটা গেঞ্জি আছে। দুইজনের দুইটি গামছা আর আপনার ঐ বেডশিট আছে। যা বোঝা যাচ্ছে তাতে বেশ কয়েকদিন আমাদের থাকতে হবে এখানে। আর তা থাকতে হলে, এতেই সব হবে না। আরো কিছু লাগবে। বিশেষ করে, আপনার জন্যে আর একখানা শাড়িতো লাগবেই। এক কাপড়ে থাকবেন কয়দিন?

মিস্ জেরিনা সহাস্যে বললো– বাবা! একদম সংসার পেতে বসছেন নাকি?

ঃ কতকটা তাইতো। এক জায়গায় একাধিক দিন থাকতে হলে অনেক কিছুই লাগে।

এরপর পোঁটলা খুলে শাড়ি বের করেই মিস্ জেরিনা সবিস্ময়ে বলে উঠলো–ওমা! কি ফিনফিনে মূল্যবান শাড়ি! এতো দামের শাড়ি কিনলেন কেন?

ঃ নইলে কি মোটা তাঁতের শাড়ি পরতে পারবেন আপনি? জনমটাতো কাটিয়েছেন বোধ হয় প্যান্ট আর হাফপ্যান্ট পরে। মোটা শাড়ি পরতে গেলে তো গায়ে সেটা জড়িয়ে পেঁচিয়ে নিজেকে একটা পোঁটলা বানিয়ে ফেলবেন। যান-যান, শাড়ি-ব্লাউজ আর পেটিকোট্ নিয়ে ঐ বাথরুমে যান। প্যান্ট গেঞ্জির এই উদ্ভট পোশাক বদল করে আসুন। এসব পরে থাকলে চোখ তুলে তাকান যায় না আপনার দিকে।

শাড়ি দেখে সেটা পরার খুবই আগ্রহ হলো জেরিনা বিবির। শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট নিয়ে সে বাথরুমে ছুটে গেল তৎক্ষণাৎ। পোশাক বদল করে বেরিয়ে এসে হাসিমুখে আজিজুল হককে প্রশ্ন করলো– এখন আমাকে কেমন লাগছে, বলুন তো?

আজিজুল হক বললো– চমৎকার! বেশ সুন্দর।

কপট খেদে মিস্ জেরিনা বললো– সুন্দর না ছাই! নিশ্চয়ই খুবই উদ্ভট লাগছে।

ঃ না, এখন আর উদ্ভট লাগছে না। উদ্ভট লাগে ঐ প্যান্ট-গেঞ্জি পরে থাকলে। এখন আপনাকে অনেকটা ইন্দিরা গান্ধীর মতো লাগছে।

ঃ হ্যাঁ। মাথার চুল পুরুষের মতো খাটো করে ছাঁটা আর পরনে শাড়ি-ব্লাউজ। এখন একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীর সাথেই তুলনা করা যায় আপনাকে।

ঃ বাজে কথা! ইন্দিরা গান্ধী দেখতে কত সুন্দরী ছিলেন!

ঃ আপনিই কি কম সুন্দরী মেয়ে? আপনার তুলনা মেলা ভার।

ঃ অর্থাৎ?

www.boighar.com

ঃ এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আপনি। প্যান্ট-গেঞ্জি পরে তো সং সেজে ছিলেন এতদিন। এখন যা সুন্দর লাগছে আপনাকে, তা বলে শেষ করা যাবে না। মাথায় লম্বা চুল থাকলে আরো যে কত সুন্দরী লাগতো আপনাকে– তা আর বলবো কি!

মিস্ জেরিনা হাসি চেপে বললো– আপনি মন যোগানো কথা বলছেন!

ক্ষেপে গেল আজিজুল হক। বললো– মন যোগানো মানে? আমি কি আপনার সাথে পিরীত করতে চাই, না সে উদ্দেশ্যে এসেছি আমি এখানে যে, মন যোগানো কথা বলবো আপনার? নেহায়েত বেকায়দায় পড়েই তো–

জ্বলতে লাগলো আজিজুল হকের দুই চোখ্ তা দেখে ঘাবড়ে গেল মিস্ জেরিনা। বিনীত কণ্ঠে বললো– আমি দুঃখিত। আমার ভুল হয়েছে। আমি বেয়াদবি করে ফেলেছি। দোহাই, এর জন্যে রাগ করবেন না। আমারই কি এটা কোন রসিকতা করার সময়? অজ্ঞাতেই ফস্ করে বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে।

জেরিনা বিবির মুখমণ্ডল করুণ হলো। আজিজুল হক বললো– থাক, এতটা আফসোস্ করতে হবে না। আসল ব্যাপারটা তো বুঝবেন না আপনারা। কোন বেগানা মহিলার এতটা সান্নিধ্যে আসা আমাদের জন্যে হারাম। ইসলাম এটা এলাও করে না। কিন্তু ঐ যে কথা আছে, বিপদে নিয়ম নাস্তি। সেই অবস্থা এখন আমার। কাজেই, বুঝে-সুঝে কথা বলবেন।

মিস্ জেরিনা নতমস্তকে বললো– আচ্ছা-আচ্ছা, আর ভুল হবে না।

কেটে গেলো একটা দিন। খান সাহেবের উন্নতি হলো আরো কিছুটা। পরের দিন বেলা দশটার দিকে ক্লিনিকের এক আয়া এসে আজিজুল হককে বললো– সাহেব, ডাক্তার সাহেব বিল পরিশোধ করতে বললেন– আপনাদের। দৈনিকের বিল দৈনিক পরিশোধ করাই এখানের নিয়ম। গতকাল তো তা করেন নি আপনারা।

আজিজুল হক বললো– আমরা তো তা জানতাম না। ঠিক আছে। তুমি যাও, আমি আসছি।

আয়াটা বেরিয়ে গেলে মিস্ জেরিনা তার একমাত্র সম্বল গলার চেনটা খুলতে খুলতে বললো– এটা বাজারে নিয়ে যান। এটা না বেচলে তো নগদ কোন টাকা-পয়সা হাতে নেই আমার। আমার পার্সটা ট্রেনেই ছিটকে পড়েছে কোথাও।

আজিজুল হক বাধা দিয়ে বললো– থাক-থাক ওটাতে এই মুহূর্তে হাত দিতে হবে না। আমার কাছে যা আছে তাই দিয়ে চলুক আপাতত। অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে তাতে যে পরে ওটাতে হাত দিতে হবে না, এমনটি বলা যাবে না জোর দিয়ে। তবে আপাতত ওটা থাক।

জেরিনা বললো– থাকলে চলবে কি করে? অনর্থক এক গাদা টাকা খরচ করে এলেন গতকাল। এরপরে আর ডাক্তারের বিল শোধ করবেন কি করে? বিলটাও সামান্য টাকার হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই মোটা টাকার বিল। ডাক্তারের ফি, ওষুধের দাম, এই কেবিনের ভাড়া, এর উপর আবার আমাদের খাই খরচ। বাইরে খাওয়ার কোন সুবিধে নেই বলেই, এখানে খেতে হচ্ছে আমাদের। কাজেই, কম টাকায় হবে না। আপনি এই মালাটা নিয়ে যান।

আজিজুল হক বললো– বেশ তো, লাগলে অবশ্যই নেবো। কিন্তু আমি আগে গিয়ে দেখি, বিলটা কত টাকার? না দেখলে তো কিছুই অনুমান করা যাবে না।

ঃ দেখবেন? ঠিক আছে, তাহলে তাই আগে দেখে আসুন। এই চেনের দামেও কুলোবে কিনা, কে জানে!

ঃ ম্যাডাম!

ঃ অবশিষ্ট দিনগুলো চালাবো কি করে, সেই ভাবনাতেই দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি আমি।

ঃ না, উম্মিদ হর্বেন না। যত মুস্কিল, তত আহসান। আগে গিয়ে দেখি, কোন পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

মিস্ জেরিনা জোর দিয়ে বললো– হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তাহলে যান। পরিস্থিতিটা জেনে নেয়া খুবই দরকার। টাকার প্রতি ডাক্তারের যে সচেতনতা প্রথমেই লক্ষ্য করেছি, তাতে কোন চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, কে জানে। যান শিগগির যান।

তাই গেল আজিজুল হক। কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা ডাক্তারের চেম্বারে এসে হাজির হলো। আজিজুল হককে দেখেই ডাক্তার সাহেব নড়েচড়ে উঠে সালাম দিয়ে খোশকণ্ঠে বললেন– আসুন ভাই সাহেব, আসুন-আসুন, বসুন।

সামনের চেয়ারের প্রতি ইঙ্গিত করলেন ডাক্তার। সালামের জবাব দিয়ে আজিজুল হক বসতে বসতে স্মিতহাস্যে বললো– তাজ্জব! আমাকেই সালাম দিলেন আগে? আমাকে সালাম দেয়ার কোন ফুরসুতই দিলেন না?

জবাবে ডাক্তার সাহেব জোর দিয়ে বললেন– দিতেই হবে আগে সালাম। আপনাকে তো লক্ষ্য করেছি আমি। যে আল্লাহওয়ালা লোক আপনি, আপনাকেই তো আগে সালাম দেয়া উচিত আমার।

ঃ আল্লাহওয়ালা লোক!

ঃ বিলকুল-বিলকুল। জব্বোর পরহেজগার লোক আপনি।

ঃ না-না, মোটেই কোন মূল্যবান লোক নই আমি। আমাকে এভাবে শরমিন্দা করবেন না। তা যাক, এবার মেহেরবানী করে বিলটা দেখান দেখি। কত টাকার বিল হয়েছে, সেটা আগে জানার দরকার।

ঃ ও-হ্যাঁ, বিলটা তৈয়ার করাই আছে। এই নিন। প্রথম থেকে গতকালের গোটা দিনের হিসাবটা ধরা আছে এর মধ্যে।

বিলের কাগজটা এগিয়ে দিলেন ডাক্তার সাহেব। টাকার অঙ্কতে চোখ দিয়েই বিভ্রান্ত হয়ে গেল আজিজুল হক। চোখ মুছে বিলটায় নজর দিলো আবার। স্থির নজরে দেখার পর আজিজুল হক বিস্মিতকণ্ঠে বললো–একি! একি অসম্ভব ব্যাপার!

ডাক্তার সাহেব বললেন– অসম্ভব ব্যাপার! কি অসম্ভব ব্যাপার ভাই সাহেব?

ঃ আপনার এই টাকার অঙ্ক।

বিলে আঙ্গুল দিয়ে আজিজুল হক ফের বললো– এই যে এই টাকাটাই তো দাবি আপনার, নাকি?

ঃ জি-জি, ঐ টাকাই। বেশি হয়েছে বলে কি মনে হচ্ছে আপনার?

ঃ বেশি! বেশি কি বলছেন? একজন ভিলেজ কোয়াকের মানে হাতুড়ে ডাক্তারের যে বিল হয়, সেটাও তো নয়। এত কম টাকার বিল আপনার আর এত কম দাবি–এটা হয় কি করে?

ডাক্তার সাহেব হেসে বললেন– কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

ঃ হবে কি করে? গত রাতের আগের রাত থেকে এখন পর্যন্ত খাটছেন। আপনার কি কেবিনের ভাড়া, ওষুধপত্রের দাম, আমাদের আহার-মানে সবকিছু ধরলে বিলটা এত কম পয়সার হয় কি করে? আমি তো এটা কল্পনা করতে পারছিনে!

ঃ না পারার কোন কারণ নেই ভাই সাহেব। শুধু ওষুধের দাম, আপনাদের আহার আর নার্স-আয়াদের জন্যে সামান্য কিছু মজুরি। এসবে তো এর বেশি আর আসে না।

ঃ সেকি! আপনার ফি, কেবিনের ভাড়া, অন্যান্য খরচ–

ঃ ওসব কিছুই ধরা হয়নি।

ঃ ধরা হয়নি মানে? পরে ধরবেন?

ডাক্তার ফের হেসে বললেন– না, কোনদিনই ধরবো না।

আজিজুল হক থতমত করে বললো- অর্থাৎ? কিছুইতো বুঝতে পারছিনে আমি।

ঃ আরে ভাই, বুঝবেন কি? ট্রেন এ্যাকসিডেন্টে সর্বস্ব হারানোর সাথে জখম হয়ে আপনারা আমার কাছে এসেছেন। আমি কি মানুষ নই যে, আপনাদের এই অবস্থায় সবকিছুর দাম আপনাদের কাছ থেকে আদায় করে নেবো?

ঃ ভাই সাহেব।

ঃ আমাকে ফি দিতে হবে কেন? আপনাদের মুসিবতে একটু সার্ভিস দেয়ার মওকা আমাকে দেবেন না?

ক্যাবিনটা ফাঁকাই পড়ে ছিল। নতুন ক্লিনিক, এখনও দুই দুইটে ক্যাবিন ফাঁকাই পড়ে আছে। আপনাদের এই মুসিবতে ঐ ফাঁকা কেবিনটা দিয়ে কি আমি আপনাদের কিছুটা খেদমত করতে পারিনে? আল্লাহওয়ালা মানুষ আপনি? সওয়াবটা কি কেবল আপনারই দরকার? আমার দরকার নেই?

ঃ বলেন কি? এভাবে সওয়াব কামাতে গেলে ডাক্তারি ব্যবসা যে আপনার লাটে উঠবে ভাই সাহেব!

ঃ জি না ভাই সাহেব। আমি জাতে মাতাল, কিন্তু তালে ঠিক। মুসিবতে না পড়ে স্বাভাবিক অবস্থায় যদি আসতেন আর অর্থনৈতিক সঙ্গতিটা থাকতো, তাহলে বুঝতে পারতেন- এই বিল পরিশোধ করতে কত টাকা লাগে। মানুষের মুসিবতে মানুষকেই তো এগিয়ে আসতে হয় ভাই সাহেব। আমি কি মানুষ থেকে আলাদা কিছু?

পলকখানেক অবাক হয়ে চেয়ে থাকার পর আজিজুল হক বললো- তাজ্জব! আমাকে আপনি বলছেন আল্লাহওয়ালা লোক। কিন্তু আপনি যে কত বড় আল্লাহওয়ালা লোক, তা তো আমি পরিমাপ করতে পারছিনে!

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ প্রথমেই আপনি যখন খরচের প্রশ্ন তুললেন তখন বুঝলাম, কম পয়সায় চিকিৎসা এখানে হবে না। কিন্তু এখন একি বিপরীত অবস্থা দেখছি?

ঃ বেশি খরচের কথা তো কিছু বলিনি আপনাদের! বলেছিলাম কিছু খরচের কথা। এই যে বিলে যা দেখছেন, এই খরচের কথা। ট্রেন এ্যাকসিডেন্টে নিঃস্ব লোক আপনারা। এই খরচটুকু করতে পারবেন কিনা, সেটা জানতে চেয়েছিলাম।

ঃ মাফ করবেন, এইটুকু খরচ করার সম্বলও যদি না থাকতো আমাদের?

ঃ তাহলে ঐ সাদকায়ে জারিয়া। মরণাপন্ন রুগী সমেত তো আপনাদের আমি ফেরত দিতে পারতামনা! খরচটা আমার নিজের গাঁইট থেকেই যেতো।

হাসতে লাগলেন ডাক্তার। আজিজুল হক বললো– সোবহান আল্লা! কিন্তু ভাই সাহেব, কথার পৃষ্ঠে আরো যে কথা এসে যায়। হয়তো বা আপনার খোঁজ পায়নি, কিংবা রেল কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলেই এ্যাকসিডেন্টে আক্রান্ত

আর কেউ আসেনি। আক্রান্তরা সবাই যদি এসে পড়তো এখানে, তাহলে কি করতেন?

ঃ আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু করতাম। বাদ বাকি আল্লাহতাআলা করতেন। পথ একটা আল্লাহর রহমে বেরুতোই কোন না কোন দিক থেকে।

অভিভূত কণ্ঠে আজিজুল হক কেবলই বলতো লাগলো সোবহানআল্লাহ! একি বিশ্বাস! একি ঈমানের জোর!

ডাক্তার সাহেব বললেন– আচ্ছা হয়েছে। এবার বলুন, এই বিলটা পরিশোধ করার মতো পুঁজি আপনাদের আছে নাকি সাদকায়ে জারিয়ার সওয়াবটাই নিতে হবে আমাকে?

আজিজুল হক কলরব করে বলে উঠলেন নেই মানে? প্রতিদিনের বিল যদি এই পরিমাণ হয়, তাহলে প্রায় গোটা একটা বছরই আল্লাহর রহমে এখানে থেকে যেতে পারবো আমরা।

ঃ না ভাই সাহেব, আপনাদের উপর তেমন রহম আল্লাহ তাআলা না করুন, এইটেই কামনা করি আমি। কারণ, দীর্ঘদিন ক্লিনিক-হাসপাতালে পড়ে থাকাটা কোন সুখের ব্যাপার নয়।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা বটে-তা বটে।

ঃ এসব কথা থাক। ভাই সাহেবের নামটা কি জানতে পারি?

ঃ জি-জি, একশো বার পারেন। আমার নাম মুহম্মদ আজিজুল হক। হক সাহেব নামেই আমার মহলে আমি বেশি পরিচিত।

ঃ বহুত আচ্ছা-বহুত আচ্ছা।

লহমাখানেক নীরব থেকে ডাক্তার সাহেব ফের বললেন– আর একটা প্রশ্ন করবো হক সাহেব? কিছু মনে করবেন না তো?

ঃ করুন না। এত ইতস্তত করছেন কেন?

ঃ করছি মানে, প্রশ্নটা আপনার পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কিনা, তাই–

ঃ পারিবারিক ব্যাপার?

ঃ জি-জি। সেই জন্যেই তো দ্বিধা বোধ করছি। আমিও তো এবার কিছুটা বিস্মিত হচ্ছি ভাই সাহেব! পারিবারিক কি ব্যাপার, বলুন তো?

ঃ কথা হলো, আপনি এমন দাড়ি-টুপিওয়ালা আর পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা পরহেজগার মানুষ; এবাদত-বন্দেগীতে এতটা তৎপর আপনি অথচ আপনার বিবি সাহেবার লেবাসটা এমন কেন?. একদম খেস্টানি লেবাস!

আজিজুল হকের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। বললো– আমার বিবি সাহেবা! আমার বিবি সাহেবা কোথায় দেখলেন আপনি?

ঃ কেন, ঐ যে আপনার সাথে যে মহিলা আছেন, উনি কি আপনার বিবি, মানে বিবাহিতা স্ত্রী নন।

ঃ তওবা-তওবা, তা হবেন কেন?

ঃ তাহলে উনি কে হন আপনার? বহিন?

ঃ না, তাও নয়।

ঃ তবে?

ঃ উনি আমার সহযাত্রী, মানে সহযাত্রিনী। ঐ রুগী উনার বাপ। এই বাপবেটি দুইজনেই আমার সহযাত্রী ও সহযাত্রিনী।

ঃ সহযাত্রিনী? একদম কোন সম্পর্ক নেই?

ঃ একদম নেই। হঠাৎই উনাদের সাথে জড়িয়ে গেছি আমি।

ডাক্তার সাহেব এবার খুবই বিস্মিত হলেন। বললেন– তাজ্জব কথা! ঘটনাটা খুলে বলুন তো?

আজিজুল হক মোটামুটি সকল ঘটনা বর্ণনা করলো। ট্রেনে তাদের কীভাবে পরিচয় হলো, কীভাবে এ্যাকসিডেন্টটা ঘটলো, সবকিছু পুড়ে গেল, ঠ্যাং ভাঙলো ভদ্রলোকের আর সেই প্রেক্ষিতে মিস্ জেরিনা কীভাবে তাকে জড়িয়ে ফেললো তাদের সাথে, সবকথা বলে গেল এক এক করে।

শুনে ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এরপরে বললেন– বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি তাহলে কোথায় যাচ্ছিলেন?

আজিজুল হক বললো– খুলনায়।

ঃ কোন আত্মীয়ের বাড়িতে?

ঃ জি না, একটা চাকরিতে যোগদান করতে যাচ্ছিলাম।

ঃ চাকরি? কি চাকরি? মানে কি কাজ?

ঃ অধ্যাপনা। অধ্যাপকের কাজ।

কিছুটা চমকে উঠলেন ডাক্তার সাহেব। বললেন– অধ্যাপনা! সেটা কি মাদ্রাসার?

ঃ না, কলেজের।

ঃ কলেজের! নতুন কলেজ বুঝি?

ঃ জিনা, বেশ পুরাতন আর বড় কলেজ।

ঃ বলেন কি? কোন সাব্‌জেক্টের অধ্যাপক আপনি?

ঃ পলিটিক্যাল সাইন্সের।

ঃ আরে বাসরে! পলিটিক্যাল সাইন্সের? পলিটিক্যাল সাইন্স এর অধ্যাপক আপনি? আমি ভাবলাম, আপনি মাদ্রাসা লাইনে পড়া লোক!

ঃ জি হ্যাঁ, মাদ্রাসা লাইনেও পড়েছি আমি দীর্ঘদিন। এর পরে জেনারেল লাইনে এসে বি.এ. আর পলিটিক্যাল সাইন্সে এম.এ. পাস করেছি।

ঃ তাজ্জব! পলিটিক্যাল সাইন্সের এম. এ. পাস আর জেনারেল লাইনে পড়া লোক আপনি?

ঃ জি-জি।

ঃ খুলনার এক বড় কলেজে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন?

ঃ জি-হ্যাঁ।

ঃ তা কোথা থেকে আসছিলেন? এর আগে কোন কলেজে ছিলেন কি?

ঃ জি ছিলাম। দিনাজপুরের এক অপেক্ষাকৃত ছোট কলেজে ছিলাম। ওখান থেকেই খুলনার এই এ্যাপয়েন্টমেন্টটা পেয়েছি আমি।

ঃ ঐ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে খুলনায় যাচ্ছিলেন?

ঃ ঠিক তাই। পার্বতীপুরে একটু কাজ ছিল। তাই ঐ ইস্তফা দিয়ে দিনাজপুর থেকে পার্বতীপুরে আগে আসি আর পার্বতীপুর থেকে খুলনার ট্রেন ধরি। এর পরেই পথে এই এ্যাকসিডেন্ট।

ঃ আচ্ছা! তা চাকরিতে না গিয়ে আপনি এই যে এদের সাথে এলেন, এতে আপনার চাকরির ক্ষতি হবে না কোন?

ঃ হতেই পারে। যোগদানের দেরি হলে তাঁরা নেকস্টম্যানকে নিয়ে নিতেও পারেন। আমি তাঁদের ফার্স্ট চয়েস। আমার দেরি হলে তাঁরা কি বসে থাকবেন? তাঁদের নেকস্ট চয়েসকে নিয়ে নিবেন।

ঃ সেকি! তাতে তো চাকরি যাবে আপনার?

ঃ হ্যাঁ, তা যাবেই তো।

ঃ সেজন্যে দুঃখ নেই আপনার?

ঃ কিছুটা থাকলেও খুব বেশি একটা নেই।

ঃ খুব বেশি একটা নেই? বলেন কি! চাকরি এ বাজারে একটা দুর্লভ বস্তু আর আপনার খুব একটা নেই, এর অর্থ?

আজিজুল হক মৃদু হেসে বললো– ভাই সাহেব, পরীক্ষার রেজাল্ট আমার বরাবরই বেশ ভাল। বি. এ. পরীক্ষা পাস করেছি ডিস্টিংশান নিয়ে। এম. এ. তে ফার্স্ট ক্লাস। তাই অনেক কলেজেই চাহিদা আছে আমার। এমন কি ভারসিটিতেও। আর একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে সামান্য কয়েকদিন সময় লাগবে, এই আর কি। এছাড়া, মাদ্রাসা লাইনেরও ডিগ্রি আছে। সেখানে যেতে চাইলে যে কোনদিন যাওয়া যায়।

ডাক্তার সাহেব তাজ্জব হয়ে বললেন– বলেন কি, এমন ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার আপনার?

ঃ সব প্রশংসাই আল্লাহর ভাই সাহেব, আমার কৃতিত্ব কি?

ঃ তাই আপনি নিশ্চিন্তে এদের সাথে আছেন?

ঃ থাকতেই হবে। চাকরি নিয়ে দুর্ভাবনা থাকলেও যে থাকতেই হবে ভাই সাহেব। চোখের ওপর এদের এই মহামুসিবত দেখে, আমি পালিয়ে যাই কি করে?

ঃ সাব্বাস্! সত্যিই আপনি একজন মানুষের মতো মানুষ! একজন অনন্য মানুষ!

ঃ কি যে বলেন! এ টুকু তো সব মানুষেরই করা উচিত। এতে এত বাহবা পাওয়ার কি আছে?

ঃ জি-জি, করা তো উচিত। কিন্তু তা কয়জন করে আর কয়জন তা করতে পারে? তা যাক এতই যখন জানলাম তখন আর একটু জানতে চাই। ভাই সাহেবের নিবাসটা কোথায়? মানে, বাড়ি?

ঃ বৃহত্তর রাজশাহীর জেলার এক মহকুমায়। অবশ্য, প্রায় সব মহকুমাই এখন জেলা।

ঃ হ্যাঁ, তাই বটে। তা কে কে আছেন আপনার বাড়িতে? তাঁরা আপনার এই পদক্ষেপটা কিভাবে নেবেন? চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই চাকরি খোঁজার পদক্ষেপ?

ঃ ভালভাবে নেবেন না। কোনদিনই ভালভাবে নেননি, এবারও নেবেন না।

ঃ কে, আপনার ওয়াইফ?

ঃ আমি শাদি এখনো করিনি। নেবেন না আমার আব্বা-আম্মা, ভাই-বেরাদার- সবাই।

ঃ কি রকম?

ঃ বাড়িতে আমার আব্বা-আম্মা আছেন আর আছে আমার বড় দু'জন ভাই। আমার অবস্থাটা সেখানে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো ভাই সাহেব। আমার ঐ দু'ভাইকে নিয়েই তুষ্ট আছেন আব্বা-আম্মা। আমার তেমন পাত্তা নেই তাঁদের কাছে।

ঃ কসুর নেবেন না। আর একটু খোলাসা করে বলুন তো! যতই আপনার ব্যাপারে জানছি, ততই অবাক হচ্ছি!

ঃ ভাই সাহেব, আমার আব্বা খুবই বড়লোক মানুষ। অন্ততঃ মধ্যবিত্তদের তুলনায় সাংসারিক অবস্থা তাঁর অনেক বেশি ভাল। সেই সাথে সুশিক্ষিত আর রীতিমতো পরহেজগার মানুষ তিনি। আমার ঐ দু'ভাইও যথেষ্ট এলেমদার ও পরহেজগার লোক। পড়াশুনা শেষ করে তাঁরা এসে ব্যবসায় নিয়োজিত হয়েছেন। বড় বড় ব্যবসা করেন তাঁরা। আমার আব্বা-আম্মা চাইলেন, লেখাপড়া শেষ করে এসে আমিও ব্যবসায় যোগদান করি। চাকরির নামে গোলামি না করে ব্যবসায় যোগ দিয়ে স্বাধীনজীবন যাপন করি আর দীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করি।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আমার আব্বার যুক্তি দু'টি– যেকোন চাকরির চেয়ে ব্যবসায় আয়-উপায় বেশি আর ব্যবসাটা আমাদের নবী করীম (সা.) এর পেশা। দীনের পথে খেদমত দেয়ার ব্যাপারে চাকরির চেয়ে অনেক স্বাধীনতা আছে এখানে।

ঃ হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ঠিক কথাই তো।

ঃ কিন্তু খাসিলতটা যাবে কি করে ভাই সাহেব? জীবনের শুরু থেকেই অধ্যাপনার দিকে আমার বেজায় ঝোঁক। ছাত্রদের সঠিক জ্ঞান দান করাও একটা পুণ্যের কাজ– এই ধারণাতেই নিমগ্ন হয়ে রয়ে গেলাম। ফলে পিতার ইচ্ছা পূরণ না করে নিজের ইচ্ছা পূরণ করার পথে পা বাড়ালাম এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরুনোর পরেই। এতে করে পিতামাতার কাছে ছাগলের তৃতীয় বাচ্চা হয়ে গেলাম আমি।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ অন্য দু'ভাইয়ের কদরের মতো আমার তেমন কদর নেই আব্বা আম্মার কাছে। আমার এই চাকরি করে বেড়ানোটা তাঁরা পছন্দ করেন না মোটেই আর তাই আমার এই পদক্ষেপ নিয়ে তাঁরা ভাবতেও মোটেই যাবেন না।

ঃ আচ্ছা। তাহলে সবদিক দিয়েই ড্যাম কেয়ার আপনি?

ঃ অর্থাৎ?

অর্থাৎ সবদিক দিয়েই আপনি তাহলে বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গ?

আজিজুল হক রসিকতা করে বললো– বিহঙ্গ নয় ভাই সাহেব, বরং বলুন–বৈরাগী। বাঁধনবিহীন বৈরাগী।

ঃ বাঁধন বিহীন বৈরাগী।

ঃ জি-জি। এখন দরকার একখান ডুগডুগী।

ঃ সেই সাথে এক বোষ্টুমী, না কি বলেন?

ডাক্তার সাহেবও রসিকতা করলেন। ঠিক এই মুহূর্তে এক আয়া এসে আজিজুল হককে বললো– সাহেব, আপনার ঐ মেম সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

আজিজুল হক ব্যস্ত হয়ে উঠে বললো– অ্যাঁ, ডাকছেন? আচ্ছা যাও, আমি এক্ষুণি আসছি।

আয়া চলে যেতেই আজিজুল হক উঠে দাঁড়িয়ে বললো– ইশ্! অনেকক্ষণ হয়ে গেল! বিলের টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি ভাই সাহেব, আমি এখন আসি–

ডাক্তার সাহেব জোর দিয়ে বললেন–হ্যাঁ-হ্যাঁ, শিগগির যান। নইলে আবার বেজার হবেন বোষ্টুমী!

ঃ তার উপর আবার দিশী নন, বিলাইতি বোষ্টুমী, না কি বলেন?

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন দুইজনই।

আরো দুইদিন গেল। রুগী জাবেদ খান সাহেবের জ্বরটা নেমে গেল পুরোপুরি। ক্ষতস্থানের ব্যথাটাও উপশম হলো অনেকখানি। বিছানায় উঠে বসলেন খান সাহেব। এরপর এক সময় আজিজুল হককে কাছে বসিয়ে তার অবদানের স্মরণে প্রশংসায় তিনি মুখর হয়ে উঠলেন। বললেন– প্রথম দেখেই আমি বুঝেছিলাম, তুমি সাধারণ ছেলে নও। আর পাঁচজনের চেয়ে তুমি একেবারে পৃথক এক ছেলে।

তোমার আদব-আচরণ-কথাবার্তা, সবই তখন মুগ্ধ করেছিল আমাকে। বুঝেছিলাম, সত্যিই একজন অত্যন্ত সৎ আর জ্ঞানবান ছেলে তুমি। কিন্তু এখন দেখছি, বুঝতে অনেক বেশি ঘাটতি ছিল আমার। তুমি শুধু সৎ আর গুণবান ছেলেই নও, তুমি একজন দেবদূত, মানে ফেরেশতাতুল্য ছেলে। অপূর্ব-অপূর্ব! এবোরেই অতুলনীয়।

খান সাহেব আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। আজিজুল হক বিব্রতকণ্ঠে বললো– ছিঃ-ছিঃ। এসব কি বলছেন? আমি নিতান্তই সাধারণ এক মানুষ। কোন অভিনবত্ব আমার মধ্যে নেই। খামাকা আপনি এসব বলছেন কেন।

খান সাহেব বললেন– কেন বলবো না বাপজান? আমি যে আমার মেয়ের মুখে সব শুনেছি। আমার জন্যে তুমি যা করেছো, তার যে আমি কোন নজির খুঁজে পাচ্ছিনে এই স্বার্থপর দুনিয়ায়?

ঃ মুরুব্বি!

ঃ আমি যে আজ বেঁচে আছি, এটা তো একমাত্র তোমার মহত্ত্বের বদৌলতেই বেঁচে আছি। তুমি না থাকলে, আজ আমার এই বেঁচে থাকাটা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। জেরিনা মেয়েছেলে ঐ নিধূয়া প্রান্তরে একা সে কিছুই করতে পারতো না। ঐ প্রান্তরেই ধুঁকে ধুঁকে মরে থাকতে হতো আমাকে।

আজিজুল হক বাধা দিয়ে বললো– আহ্হা। আপনি থামুন তো? হায়াত-মউত- রেজেক- দৌলত এগুলো সবই আল্লাহ তাআলার হাতে। খামাখা আমাকে গুনাহগার আর শরমিন্দা করছেন কেন? একজন মানুষের যা করা উচিত, তার বেশি আমি কিছুই করিনি। আপনি অকারণেই উদ্বেলিত হয়ে উঠছেন।

খান সাহেব বললেন– কখ্খনো নয়, মোটেই অকারণে নয়। জেরিনার মুখে আমি সব শুনেছি। নিছক পরের জন্যে এত শ্রম দিতে, আর তার চেয়েও বড় কথা, নিজের গাঁটের পয়সা উজাড় করে এতটা করতে কোন মানুষ পারে–এটাতো আদৌ জানা ছিল না আমার। এমন মন আর মানসিকতা তুমি কোথা থেকে পেলে বাপজান? এমন মহত্ত্ব তুমি অর্জন করলে কি করে?

আজিজুল হক অসহায়কণ্ঠে বললো– নাঃ, আমাকে আর এখানে থাকতে দিলেন না জনাব! অহেতুক আমাকে অতিমানব বানানোর এই আবেগ যদি আপনি সংবরণ না করেন, তাহলে পালানো ছাড়া আমার আর উপায় নেই।

আজিজুল হক নড়েচড়ে উঠলো। খান সাহেব তৎক্ষণাৎ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– আচ্ছা-আচ্ছা, এসব কথা আর বলবো না। তুমি বসো বাপজান, যেও না। অন্তত কিছুক্ষণ বসে থাকো আমার কাছে।

ফের স্থির হয়ে বসে আজিজুল হক বললো– হ্যাঁ, এসব কথা আর বলবেন না। বললে, অন্যকথা বলুন।

ঃ ঠিক আছে– ঠিক আছে। অন্যকথা মানে কোন কথা বলি–

খান সাহেব হাতড়াতে লাগলেন। আজিজুল হক বললো– আমার খবর অর্থাৎ আমি একটা কাজের ব্যাপারে খুলনায় যাচ্ছিলাম– একথার সাথে আমার বাড়ি ঘরের কিছু কথা হয়তো আপনার মেয়ের মুখে শুনেছেন। এবার আপনাদের কথা বলুন।

ঃ আমাদের কথা! আমাদের কি কথা বাপজান?

ঃ বাড়ি আপনাদের বাগেরহাটে, এটুকুই শুধু জেনেছি। আপনারা এলেন কোথা থেকে, এতসব মালামাল কোথা থেকে আনলেন, কোথায় যাচ্ছিলেন– এসব কিছুই জানিনে।

ঃ ও হ্যাঁ, এই কথা? তা বাপজান আমাদের অরিজিন্যাল বাড়ি হলো পশ্চিম বাংলার বালুর ঘাটে। দেশ বিভাগের পরে আমাদের বাবা আমাদের নিয়ে এসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাগেরহাটে সেটেল হন। আমরা তখন ছেলে মানুষ। সেই থেকে আমরা এদেশের নাগরিক। আমি বিয়েও এদেশেই করেছি।

ঃ আচ্ছা। তা এখন এলেন কোথা থেকে? এতসব মালামাল কোথা থেকে আনছিলেন?

ঃ ঐ বালুরঘাট থেকেই এলাম। বালুরঘাটে এখনো আমাদের কিছু জ্ঞাতি গোত্র আর সামান্য বিষয়বিত্ত আছে। অনেক দিনি পরে নিজের জন্মস্থানে গিয়েছিলাম। আর ঐসব মালামাল সেখান থেকেই আনছিলাম। কিন্তু ললাটের লিখন, কিছুই আনতে পারলাম না।

নিঃশ্বাস ফেললেন খান সাহেব। আজিজুল হক বললো– জনাব!

ঃ শুনলাম, সব নাকি ট্রেনেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ঃ জি জনাব, জি-জি। আমার ব্যাগটাও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ্যাকসিডেন্ট ঘটার সাথে সাথে দুই তিনটে কামরায় কি করে যে আগুন ধরে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। পাশের কোন কামরায় দাহ্য পদার্থ ছিল, না বিদ্যুতের তার থেকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটলো– কিছুই জানতে পারিনি।

খান সাহেব বললেন– হবে-হবে। হয়তো ঐ রকমই কিছু হবে।

এই সময় মিস্ জেরিনা বাইরে থেকে এসে কেবিনে ঢুকলো এবং দুইজনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখেই পিতাকে আক্রমণ করে বললো- ব্যস্! একটু সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই শুরু করেছেন বকবকানি? আপনার এই স্বভাবটা যে আর কবে যাবে, তাই আমি ভাবছি।

ঃ কোন স্বভাব মা-মণি?

ঃ অন্যের লাগাতার তারিফ করার স্বভাব। কাউকে কিছু ভাল কাজ করতে দেখলেই তার তারিফের উচ্ছ্বাসে আপনি বেসামাল হয়ে যান। তারিফের ঝড় তোলেন সর্বক্ষণ আর সর্বত্র। এখানেও নিশ্চয়ই ঐ ব্যাপারটাই চলছে?

ঃ কৈ, নাতো! সর্বক্ষণ তুলি নাতো। আজিজুল হকের সাথে এই আজকেই তার অসমান্য আত্মত্যাগের ব্যাপারে কথা বলছি দুটো। উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না, তাকে কি বলে জানিস্? তাকে বলে কৃতঘ্ন।

ঃ জানি-জানি। স্বীকার করতে বারণ করছে কে? অসুস্থ শরীর নিয়ে অধিক বক্ বক্ করা ঠিক নয়। এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি মাত্র।

ঃ বলিনি-বলিনি, অধিক কথা বলিনি। যে দুই একটা কথা না বললেই– নয় তাই বলেছি শুধু। এই যে তোর আজকের এই লেবাস, এই যে শাড়ি-ব্লাউজ ধরেছিস্, নিশ্চয়ই এটা এই বাবাজির পরামর্শেরই ফসল। জীবনে তো এসব পরতে চাসনি কখনো। এখন দ্যাখতো এসবে কত সুন্দর লাগছে তোকে! এ পোশাক পরে থাকলে, লোকেও আর বাঁকা চোখে তাকাবে না তোর দিকে।

মিস্ জেরিনা কপট রোষে বললো– নিকুচি করেছি আমি লোকের। কেউ বাঁকা চোখে তাকাবে বলেই আমি এই চৌদ্দ হাত কাপড়ের বাদাম উড়ায়ে বেড়াবো আজীবন? যাইতো একবার বাড়িতে! তখন দেখবো কে আমাকে ঠেকায়? আপনার এই বাবাজির পরামর্শের দাম তখন এক পয়সাও দেই যদি, তখন বলবেন!

ঃ জেরিনা!

ঃ তাতে তিনি যা মনে করেন, করবেন।

হাসিহাসি মুখ করে মিস্ জেরিনা আজিজুল হকের মুখের দিকে আড় চোখে তাকালো। আজিজুল হক বললো– না-না, আমার মনে করার কি থাকবে? তখন আপনি আদৌ কোন কাপড়- চোপড় না পরলেও কি কিছু বলতে যাবো না আমি। কারণ, আমি তো আর দেখতে যাবো না তখন! কিন্তু দোহাই, রাগ করে এখনই এ কাজটি করবেন না যেন?

জেরিনা বললো– ও কাজটি মানে? কোন কাজ? আদৌ কোন কাপড়-চোপড় না পরে দিগম্বরী হওয়ার কথা বলছেন?

ঃ না, বলছিনে। আপনার হাবভাব দেখে ভয় পাচ্ছি– এই আর কি!

জেরিনা চোখ পাকিয়ে বললো– খবরদার। আমাকে নিয়ে এমন নোংরা ঠাট্টা আর কখনোই করবেন না যেন।

আজিজুল হক ঠেশ্ দিয়ে বললো– বাব্বা, শেয়ালে ডাঙ্গা পেয়ে গেল বুঝি?

ঃ তার অর্থ?

ঃ জনাব আল্লাহর রহমে সুস্থ হয়ে উঠছেন, আর আমাকে পরোয়া করার গরজ কি আপনার?

এবার সত্যি সত্যিই রুষ্ট হলো জেরিনা। বললো– কি, খোঁটা দিচ্ছেন? ঐ অজুহাতে কেটে পড়ার পথ খুঁজছেন?

এরপর সে তার পিতাকে লক্ষ্য করে বললো– দেখলেন? আপনার উপকারী ব্যক্তিটির উপকারের নমুনা দেখলেন? পান থেকে চুন একটু খসলেই অমনি কেটে

পড়ার বাহানা খোঁজেন উনি। কত হাতে পায়ে ধরে যে তাকে আটকে রেখেছি আমি, তা আমিই জানি। সব সময়ই উনার উড়ু উড়ু ভাব!

খান সাহেব বললেন– সে কি বাপজান! উড়ু উড়ু করলে তো চলবে না। আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলাম কখন যে, উড়ু উড়ু ভাব করবে তুমি? একটাদিন মাঝখানে বেশ আরামেই ছিলাম। হাঁটুর বিষবেদনা তেমন একটা ছিল না। কিন্তু আজ আবার সকাল থেকে হাঁটুটা কেমন টনটন করতে শুরু করেছে। একটু একটু যন্ত্রণা হচ্ছে থেকে থেকে। আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না উঠা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ছে কে?

"মর্নিং শোজ দি ডে" প্রবাদটি কোন চিরসত্য বাক্য নয়। সব সময়ই এই কথাটা ফলে না। কিন্তু দেখা যায়, কখনো বা আবার ফলেও যায় সত্যি সত্যি। ভাল দিকটা না হলেও, মন্দ দিকটা অধিক ক্ষেত্রেই ফলে।

খান সাহেবের হাঁটুর মধ্যের ঐ টনটনে ভাবটা একটা মহামুসিবতেরই পূর্বাভাস ছিল। ঐ টন্‌টনে ভাবটা ক্রমেই একটা যন্ত্রণায় পরিণত হলো এবং সে যন্ত্রণা বাড়তেই লাগলো উত্তরোত্তর। সেদিনটা কোন মতে গেল। পরের দিন সে যন্ত্রণা একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠলো। খান সাহেব আবার যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করলেন। তাঁর আহত পা'টাও চড়চড় করে ক্রমেই ফুলে উঠতে লাগলো।

এ প্রেক্ষিতে ওষুধপত্র, প্রয়োজনীয় উপকরণ আর নার্সদের নিয়ে ডাক্তার সাহেব এলেন এবং ঘটনা কি, তা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। পুরনো ব্যান্ডেজ খুলে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখার পর ফের নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার সাহেব। বেদনাটা লাঘব করার কিছু ওষুধপত্র রেখে গেলেন মাত্র। ঘটনা কি, তা জানতে চাইলে, ডাক্তার সাহেব তখন কিছুই বললেন– না।

খানিক পরে আজিজুল হক ও মিস্ জেরিনা–এই দু'জনকেই ডেকে পাঠালেন ডাক্তার। তারা এলে ডাক্তার তাদের কিছুটা গম্ভীর ও বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন– দেখুন, আপনাদের কিছু গুরুতর কথা বলবো বলেই- এই তকলিফ আপনাদের দিলাম।

আজিজুল হক উৎকর্ণ হয়ে বললো– গুরুতর কথা!

ডাক্তার বললেন– জি, খুবই গুরুতর, যা রুগীর সামনে সরাসরি বলা ঠিক নয় বলে তখন বলিনি।

চমকে উঠলো আজিজুল হকেরা দু'জনেই। আজিজুল হক ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো– সে কি! কি কথা ভাই সাহেব? কি সে গুরুতর কথা।

একটু থেমে ডাক্তার মলিনকণ্ঠে বললেন– বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যা না বললেই নয়, তা চেপে রাখি কি করে? আপনাদের রুগীর, মানে খান সাহেবের পা'টা কেটে বাদ দিতে হবে।

এবার এরা দু'জনই একসাথে আর্তনাদ করে উঠলো। আজিজুল হক বললো– কেটে বাদ দিতে হবে? একি দুরূহ কথা বলছেন? চিকিৎসার দ্বারা কি ভাল করা যায় না?

ঃ না ভাই যাবে না। চেষ্টা তো যথেষ্টই করলাম, কিন্তু পারলাম কই?

ঃ পারলেন না? চেষ্টা করেও পারলেন না আপনি?

ঃ জি না। আমি কেন, এমন ফ্যাক্চার চিকিৎসার মাধ্যমে ভাল করতে কোন ডাক্তারই যে সক্ষম– এটা মনে করিনে আমি।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ আমি হয়তো তেমন দক্ষ ডাক্তার নই। কিন্তু অন্যখানে নিয়ে গেলেও যে সেটা সম্ভব হতো– এটা আমার চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আমার যোগ্যতাটা কম হতে পারে, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাটা কম নয় ভাই সাহেব?

আজিজুল হক বাধা দিয়ে বললো– না-না, আপনার যোগ্যতা কম, এ কথা বলছেন কেন? আমি সব শুনেছি। রাজধানীর এক মস্তবড় সরকারি হাসপাতালের সুযোগ্য ডাক্তার ছিলেন আপনি। ডাক্তার হিসেবে আপনার সুখ্যাতি যে সর্বজন বিদিত– এটাও জেনে গেছি আমি।

ঃ তা ভাই সাহেব, সুখ্যাতি কিছু থাক না থাক, দীর্ঘদিন রাজধানীর নামকরা এক হাসপাতালের ডাক্তার ছিলাম আমি। এই জায়গাটা আমার নিজের জন্মস্থান। এই প্রত্যন্ত পল্লীতে আমার এলাকার গরিব লোকজন কোন সুচিকিৎসা পায় না বলেই এই উদ্যোগ নিয়েছি আমি। সংসারটা আমার খুবই ছোট। প্রয়োজন আমার খুবই কম। তাই আমার সঞ্চিত অর্থ এনে হাত দিয়েছি এই কাজে। অতি অল্পদিন হলো এই ক্লিনিকটা চালু করেছি এখানে। নির্মাণ কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি পুরোপুরি। সমুদয় যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র আর আসবাবপত্র এনে এখনো সেট করতে পারিনি। উদ্যোগটা চালিয়ে যাচ্ছি, এই আর কি।

ঃ হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের রুগীর এ অবস্থাটা কি আপনি আজই টের পেলেন?

www.boighar.com

ঃ না ভাই সাহেব, এটা টের পেয়েছি রুগীকে প্রথম দেখেই। দেখেই বুঝতে পেরেছি, এ পা কেটে বাদ দিতেই হবে হয়তো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সেটা এখানে সম্ভব নয় বলে ভাবলাম, আপাতত ওষুধপত্র দিয়ে চেষ্টা করে দেখি কিছু করা যায় কিনা। ঠিকমতো সেট করতে পারলে হয়তো ভাঙ্গাটা জোড়া লেগেও যেতে পারে। তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সেট করার। কিন্তু ভেতরের হাড়গুলো ভেঙ্গে এতটাই কুচি-কুচি হয়ে গেছে যে, এ হাড় আর জোড়া লাগার নয়। পা'টা কেটে বাদ দেয়া ছাড়া আর উপায় নেই। শুনে মিস্ জেরিনা এবার আর্তকণ্ঠে, বললো– হায় সর্বনাশ! একটার পর একটা এ কি দুর্ভাগ্যের সুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাকে? এমন দুর্ভাগ্য যে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে– কে তা জানতো!

ডাক্তার সাহেব বললেন– কি করবেন? সবই নসিব।

বেদনা ক্লীষ্টকণ্ঠে জেরিনা ফের বললো– তা যদি পা'টা বাদ দিতেই হয়, তাহলে আর দেরি নয়, শিগগির তা করুন। যন্ত্রণায় বাবার দাপাদাপিটা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার সাহেব আবার মলিনকণ্ঠে বললেন– আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ও কাজটা করার সাধ্য আমার বর্তমানে নেই। বললামই তো, একেবারেই নতুন ক্লিনিক এটা। উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি আর অপারেশনের প্রয়োজনীয় উপকরণ এখনো গুছিয়ে নিতে পারিনি। সবে চিকিৎসাটা চালু করেছি মাত্র। এ অবস্থায় এই অপারেশন এখানে করা সম্ভব নয়।

জেরিনা বললো– এখানে সম্ভব নয়? তাহলে কোথায় সম্ভব?

ঃ ঢাকায়। রুগীকে ঢাকায় নিতে হবে। অন্য কোথাও এ কাজটা ঠিক মতো হবে কিনা, তা জানা নেই আমার।

ঃ ঢাকায় নিতে হবে?

ঃ সেইটেই খুব নিরাপদ হবে। দুশ্চিন্তার কারণ কিছু থাকবে না।

ঃ ডাক্তার সাহেব।

ঃ আমি যে হাসপাতালে ছিলাম, সেখানে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। আমার চিঠি পেলে সেখানের ডাক্তার নার্স, আয়া-হেলপার, সবাই খুব দরদ দিয়ে রুগীর চিকিৎসা আর দেখাশুনা করবে। খরচও অনেক কম পরবে। আপনারা রুগীকে সেখানে নিয়ে যান, আর দেরি করবেন না।

ঃ কিন্তু আমাদের বাড়িতো বাগেরহাট। সেখানে না গেলে যে রুগীকে ঢাকায় নেয়া সম্ভবপর হবে না।

ঃ ওরে বাপরে! না-না, এত-টানাটানি আর সময় খরচ করলে ভীষণ বিপদ দেখা দেবে। এই মুহূর্তেই রুগীকে নিতে হবে ঢাকায়। অপারেশনটা অতি শীঘ্রই সেরে ফেলতে হবে। দেরি হলে পচন ধরবে ঘায়ে। আর পচন ধরে গেলে, মানে গ্যাংগ্রীন ফরম করলে, সেরেফ হাঁটু কেটেই বাদ দিলে চলবে না। গোটা ঠ্যাংটাই কেটে বাদ দিতে হবে। অবস্থা অধিক মারাত্মক হলে, হয়তো তাতেও রক্ষে পাওয়া যাবে না।

ঃ বলেন কি! তাহলে উপায়?

ঃ উপায় ঐ একটাই, অতিসত্বর রুগীকে ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে। শিগগির তাই যান।

ঃ হায়-হায়! আমি এখন কি করি! কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করি?

জেরিনা আহাজারি করতে লাগলো। নীরবে সব শুনে আজিজুল হক ডাক্তারকে প্রশ্ন করলো– এখান থেকে ঢাকায় যাওয়ার পথটা কি ভাই সাহেব?

ডাক্তার সাহেব বললেন– পথ হলো বাসরুট। বাসই একমাত্র অবলম্বন। এখানকার এই বাজারের সামনে একটা ছোটখাটো বাসস্ট্যান্ড আছে। সকালে

আর বিকেলে দু'বার দূরপাল্লার বাস এখানে যাতায়াত করে। আজ তো আর সময় নেই। রাতের জার্নি নিরাপদ নয়। কাল সকালের বাসটা অবশ্য অবশ্য ধরুন আপনারা। এতে কোন রকম গাফিলতি করবেন না।

আরো কিছু উপদেশ দিয়ে ডাক্তার সাহেব বিদায় করলেন তাদের।

বিষণ্ন বদনে তারা ফিরে এলো কেবিনে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করলেও খান সাহেবের এবার সজ্ঞালুপ্তি ঘটেনি। বেদনা কমার ওষুধ খাওয়ার ফলে তিনি পুরোপুরি সজ্ঞানে ছিলেন। এই নিদারুণ কথাটা কি করে তাঁর কাছে তোলা যায়– কেবিনে এসে দু'জন খুবই চিন্তা করতে লাগলো। কিন্তু চেপে রাখার ব্যাপার এটা নয়, আর সময়ও নেই দেখে মিস্ জেরিনা অবশেষে কথাটা তার পিতাকে অবহিত করলো এবং ডাক্তারের উপদেশ ও সতর্কতার কথা ব্যাখ্যা করে শোনালো। শুনে খান সাহেব যন্ত্রণার মধ্যেও কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। এরপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন– আমার অদৃষ্টে এই দুর্ভোগ যদি থেকেই থাকে, তাকে আর এড়াবো কি করে? অগত্যা সেই ব্যবস্থাই কর তাহলে।

মিস্ জেরিনা সখেদে বললো– করবো তো, কিন্তু করবো কি করে? এর খরচ জোটাবো কোথা থেকে? এ যাবত সমুদয় খরচ এই হক সাহেব নিজের পকেট থেকে চালিয়ে এলেন। আমার কাছে চারটে পয়সা নেই। পুঁজি আমার এই চেনটা। এটাকে অনেকবারই বিক্রি করতে চেয়েছি। কিন্তু এই হক সাহেব তা কোনবারই করতে দেননি। এখন এই চেনটা বিক্রি করলেই কি ঢাকায় যাওয়ার খরচ আর সেখানে চিকিৎসা খরচসহ আনুসঙ্গিক তামাম খরচ সংকুলান হবে?

খান সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– তাইতো-তাইতো, একথা তো ভাবিনি? মস্তবড় প্রশ্ন এটা। আমার কাছেও তো কোন পয়সা কড়ি নেই। যা কিছু সম্বল ছিল আমার, তা সবই খেয়ে নিয়েছে ঐ এ্যাকসিডেন্টে। এখন উপায়?

আজিজুল হক বললো– আচ্ছা জনাব, আপনার বাড়িতে খবর দিলে কি টাকা নিয়ে কেউ ঢাকায় আসবেন না? আপনার বাড়িতে কি এমন কেউ নেই?

মুখ তুলে খান সাহেব উদাসকণ্ঠে বললেন– আমার বাড়িতে?

ঃ জি-জি।

ঃ বাবাজি, আমার বাড়ির খবর সুখকর কিছু নয়। জেরিনার আম্মা অনেক আগেই ইহধাম ছেড়ে চলে গেছেন। রেখে গেছেন এই জাহানারা বেগম জেরিনা আর মনোয়ারা বেগম মেরিনা নামের দুই মেয়েকে। কোন পুত্র সন্তান নেই আমার। দু'জন সৎভাই আছে বাড়িতে। আমার ছোট তারা তবু তারা একান্নবর্তী নয়, পৃথক অন্নে বাস করে তারা। মতের বিরোধ হেতু তাদের সাথে আমার সম্পর্কটাও প্রীতিকর নয়। তারা দুই নম্বরি মানুষ। তাদের সাথে বনে না আমার। এছাড়া বাইরে তেমন টাকা-পয়সাও রেখে আসিনি আমি। সব টাকা ব্যাংকে। চেকগুলোও আলমারিতে তালা বন্ধ।

ঃ জনাব।

ঃ আমি তো আর ভাবিনী যে, বাইরে এসে টাকার দরকার পড়বে আমার! তাই সে ব্যবস্থা করে আসিনি কিছু। এখন এ খবর বাড়িতে পাঠলে ঝি-চাকরের উপর ফেলে আসা আমার মেয়ে ঐ মেরিনাকেই কাঁদানো হবে শুধু, ফল কিছু হবে না।

ঃ কিন্তু আপনার ভাইয়েরা? সৎ হলেও তো তারা আপনার ভাই? মরে গেলেও কি তারা কেউ দেখতে আসবেন না আপনাকে?

ক্লীষ্ট হাসি হেসে খান সাহেব বললেন– মরার খবর পেলে তারা যে কেউ দেখতেও আসবে না, একথা বলিনে। কিন্তু অর্থকড়ি দেয়ার জন্যে তারা ছুটে আসবে ঢাকায়, এটা কল্পনা করা বৃথা।

ঃ সেকি! বনিবনার এতটাই অভাব আপনার তাদের সাথে?

ঃ না-না, বনিবনার একেবারেই অভাব, ঠিক তা নয়। মুখের বনিবনাটা মোটামুটি একরকম আছে। কিন্তু গাঁটের বনিবনাটা–

মিস্ জেরিনা বাধা দিয়ে বললো– আহ বাবা! রাখুন তো ওসব কথা! ঘরের কথা এত বাইরে আনার দরকার কি! আমি বরং এই চেনটাই বেচে ফেলি এখনই।

খান সাহেব উৎসাহভরে বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ মা, তাই কর। ঢাকায় একবার পৌঁছতে পারলে আর পয়সার অভাব হবে না। সেখানে আমার এমন কিছু লোক আছেন, খবর দিলে যারা দশবিশ হাজার নয়, লাখ টাকাও নিয়ে হাজির হবে তখনই।

ঃ এতটাই বিশ্বাস আপনার বাবা? এ বিশ্বাস কি সত্যি সত্যি ফলপ্রসূ হবে?

ঃ কেন হবে না? বন্ধু-বান্ধবের কথা বাদই দিলাম। এমন লোকও সেখানে বেশ কয়েকজন আছে, যারা আমার কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে এসে ব্যবসা করছে এখানে। সে টাকার অনেক ইন্টারেস্ট পাওনা আছে আমার। এ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে অনর্থক সময় নষ্ট করিসনে। যা করার তা জলদি জলদি কর। যন্ত্রণাটা আমি আর সহ্য করতে পারছিনে।

ঃ ঠিক আছে বাবা, তাহলে তাই করি।

খান সাহেব শুয়ে পড়ে ক্ষীণকণ্ঠে কাতরাতে লাগলেন। মিস্ জেরিনা আজিজুল হককে বললো– নিন, এ যাবৎ গলা থেকে খুলতে দেননি চেনটা। আর তো উপায় নেই। এক্ষুণি এটা বাজারে নিয়ে গিয়ে যে দামে হোক বিক্রি করে আসুন–

জেরিনা গলা থেকে চেন খুলতে গেল। আজিজুল হক বাধা দিয়ে বললো– থাক- থাক, আজও ও চেনটা খুলতে হবে না ম্যাডাম। ওটা যেখানে আছে, সেখানেই থাক।

ঃ তার অর্থ?

ঃ অর্থটা হলো, ঐ এক চিলতে চেন বিক্রি করলে কত টাকা আসবে ম্যাডাম? সামেন যে খরচটা দেখছি, তার অর্ধেকটাও উঠবে বলে মনে হয় না আমার।

ঃ কি রকম? কি খরচ বলুন তো?

ঃ এই বাস ভাড়ার কথাই ধরুন। এতে দূরের পাল্লা, এখানেইতো হাজার টাকার দরকার। সেরেফ তিনজনের তিন সিট্ নিলেই তো হবে না, রুগীকে শুইয়ে নেয়ার জন্যে কয়েকটা অতিরিক্ত সিটও নিতে হবে। ঢাকায় পৌঁছে হাসপাতালে যাওয়ার জন্যে ট্যাক্সীভাড়া করতে হবে। ঢাকায় গেলেই তো আর মুরুব্বির ঐ লোকদের নিকট থেকে সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাওয়া যাবে না? যোগাযোগ করে যে টাকা পেতে সময় লাগবে দু'একদিন। এই সময়টা কি আমরা রুগী নিয়ে রাস্তায় বসে থাকবো? তখনই টাকা লাগবে। রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা, অপারেশনের খরচ, অতিরিক্ত রক্তের দাম, কেবিন, অথাৎ ওয়ার্ডের খরচ, আমাদের থাকা-খাওয়া সব মিলে হিসাব করে দেখুন, কত টাকার প্রয়োজন। ঐ চেনের দামে কি তা হবে?

ঃ হক সাহেব!

ঃ থাকুন না আপনার আব্বার শুভাকাঙ্ক্ষীরা ওখানে। ঐ যে কথায় বলে, "পথের সম্বল ছেড়োনারে ভাই"। পথের উপযুক্ত সম্বলটাই। সেই উপযুক্ত সম্বল ঐ চেনের দামে আসবে না। খামাখা ওটা হস্তান্তর করবেন কেন?

ঃ সর্বনাশ! তাহলে উপায়? ঐসব খরচ চলবে কীভাবে?

আজিজুল হক বললো– এ যাবৎ যেভাবে চলেছে, সেইভাবেই চলবে।

মিস জেরিনা সবিস্ময়ে বললো– তার অর্থ? এতদিন তো আপনিই চালিয়েছেন। এ খরচটাও আপনিই চালাবেন নাকি?

ঃ চালাতেই হবে। না চালালে এই বিপদটা তরানো যাবে কি করে?

ঃ কি তাজ্জব! এত খরচ করার পরও সে টাকা আছে আপনার কাছে?

ঃ জি, তা কিছুটা আছে বৈকি।

এবার খান সাহেব অদম্য আগ্রহে প্রশ্ন করলেন– সেকি বাপজান, এত টাকা কোথায় পেলে তুমি? এত টাকা সঙ্গেই বা রেখেছো কেন?

আজিজুল হক একটু দম নিয়ে বললো– মুরুব্বি আপনাদের বাড়ির খবর তো শুনলাম। এবার আমার বাড়ির খবর শুনুন। আমার আব্বা-আম্মা ভাই-বেরাদরের সাথে আমারও তেমন বনিবনা নেই। তাদের কথা মতো আমি সংসারে সেটেল না হওয়ায়, তারা আমাকে অনেকটা ত্যাজ্য করেই রেখেছেন। আমার রোজগার তারা হাত দিয়েও ছোঁন না। আল্লাহর রহমে অনেক আছে তাদের, তাই আমার রোজগারের কোন গরজই তাদের পড়ে না। হেথা-হোথা খেটেখুটে যে সঞ্চয় আমি এ যাবৎ করেছি, তা সবই আমার সাথেই আছে। স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় সেটা সাথে করেই রাখতে হয় স্থানান্তরে যাওয়ার সময়। এবারও তাই সেটা সাথে নিয়েই আর একটা কাজের খোঁজে খুলনায় যাচ্ছিলাম। এরপর তো আপনাদের সাথেই রয়ে গেছি।

মিস্ জেরিনা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলো– সে সঞ্চয় কতটা সঞ্চয় আপনার? সেই ক্ষুদ্র সঞ্চয় আপনার এখনো শেষ হয়নি?

আজিজুল হক হেসে বললো– না ম্যাডাম পায়জামার নিচে আন্ডারওয়্যারের দুই পকেট ভর্তি করে রেখেছিলাম সেসব। একটা পকেটই এখনো পুরোপুরি খালি হয়নি। আর একটা পকেট তো অক্ষতই আছে। আপনাদের অনেকটা খরচই সামাল দিতে পারবো আমি ইনশাআলাহ।

ঃ কি তাজ্জব– কি তাজ্জব! আপনার সারাজীবনের সঞ্চয় আপনি পরের জন্যে এমন অকাতরে ব্যয় করছেন কোন উদ্দেশ্যে, বলুন তো?

ঃ উদ্দেশ্য আমার একটাই। পরে এটা সুদে-আসলে ফেরত পাবো বলে।

ঃ সুদে-আসলে ফেরত পাবেন মানে? কে আপনাকে ফেরত দেবে সুদে আসলে? আমরা?

ঃ আপনারা দেবার কে? দেবেন আমার আল্লাহ। আমার সঞ্চয় যদি ইহ জীবনে আমি পরের উপকারে ব্যয় করে যাই, পরজীবনে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে সুদে-আসলে ফেরত দেবেন সেটা।

খান সাহেব ফের উদ্বেলিত হয়ে উঠে বললেন– আমিই দেবো বাপজান। আমিই ফেরত দেবো তোমাকে। তোমার আল্লাহ তো নিশ্চয়ই দেবেন তোমাকে পরকালে। কিন্তু ইহকালেই আমি তোমার এ ঋণসুদে আসলে ফেরত দেবো তোমাকে। আমি ওয়াদা করছি তোমার কাছে।

ঃ জনাব।

ঃ অর্থনৈতিক অবস্থা আমার মোটেই খারাপ নয় বাবাজি। মোটামুটি ধনী লোক বলেই সবাই আমাকে জানে। তোমার এই ঋণ, সুদে-আসলে ফেরত দেয়ার মতো যথেষ্ট আছে আমার। আর শুধু এ ঋণটাই ফেরত দেয়া কেন, তোমার মতো ছেলেকে আমার সংসারের অর্ধেকটাই যদি দিতে পারি কখনো, তবেই ধন্য হবো আমি। চালিয়ে যাও বাপজান, এ খরচটাও তাহলে তুমিই চালিয়ে যাও।

আজিজুল হকের অর্থের উপর ভর করে এবং ডাক্তার সাহেবের চিঠি নিয়ে পরের দিন সকালেই ঢাকায় রওনা হলো তারা। সেইদিনই বিকেলে তারা ঢাকার ঐ নির্দিষ্ট হাসপাতালে এসে হাজির হলো রুগী নিয়ে। ডাক্তারের দেয়া চিঠিটা দেখাতেই হাসপাতালের সকলে পরম আগ্রহে গ্রহণ করলো তাদের। রুগীসহ তাদের ভাল একটা ওয়ার্ডে এনে তুললো এবং অতিসত্বর অপারেশনের প্রস্তুতি নিয়ে ফেললো।

যথা সময়ে ও যথা নিয়মে হয়ে গেল সাকসেস্‌ফুল অপারেশন। অতঃপর পোস্ট অপারেশন রুম থেকে রুগীকে এনে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে তোলা হলো এবং কাটা ঘা শুকানোর জন্যে চিকিৎসা চলতে লাগলো।

আজিজুল হকের কথা ঠিক। ঢাকায় এসেই সঙ্গে সঙ্গে টাকা এলো না কোথাও থেকে। প্রাথমিক খরচগুলো সব আজিজুল হকের টাকা থেকেই মেটানো হলো। খান সাহেবের কথাও ঠিক। খবর পাওয়ার একদিন পরেই প্রয়োজনীয় টাকা নিয়ে হাজির হলেন খান সাহেবের লোকেরা। খান সাহেবের অন্য শুভাকাঙ্ক্ষীরাও খবর পেয়ে ছুটে এলেন খান সাহেবকে দেখতে। যত টাকা লাগে সব তাঁরাই দেবেন– এমন ওয়াদা খান সাহেবের শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেই করলেন। নির্বিবাদে ও নিশ্চিন্তে চলতে লাগলো খান সাহেবের চিকিৎসা।

একদিন দু'দিন করে পনেরদিন কেটে গেল হাসপাতালে। অন্যকথায়, খান সাহেবের হাঁটুর ঘাটা শুকাতে এই পনেরদিন লাগলো। অতঃপর ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন খান সাহেব। অবশ্য, বেরিয়েই অমনি বাড়ির পথ ধরলেন না। আর একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য ভাল একটা হোটেলে এসে উঠলেন এবং মেয়ে ও আজিজুল হক সহকারে সেখানেই কয়েক দিন থাকলেন।

এরপর এলো খান সাহেবের ঘরে ফেরার পালা। বিদায় নেয়ার পালা এলো আজিজুল হকেরও। খান সাহেবকে কিছু বলার আগে আজিজুল হক মিস্ জেরিনাকে একান্তে ডেকে বললেন– তারপর ম্যাডাম, অনেকদিন সুখে-দুঃখে এক সাথে থাকলাম, এবার তো ছাড়াছাড়ি হতে হয় আমাদের।

মিস্ জেরিনা বিস্মিত কণ্ঠে বললো– ছাড়াছাড়ি মানে?

আজিজুল হক বললো– মানে, আপনার আব্বাতো আল্লাহর রহমে পুরোপুরি সুস্থ এখন। বাড়িতে ফিরে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন তিনি। আমাকেও এবার আমার পথ দেখতে হয়। চলে যেতে হয় আমাকে।

ঃ চলে যেতে হয় কেমন? আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন আপনি?

ঃ বাহ্! যাবো না? চিরকাল কি আমি আপনাদের সাথে থাকবো?

ঃ থাকতেই হবে। চিরকাল না হলেও, দীর্ঘকাল আপনাকে থাকতেই হবে আমাদের সাথে। এতটা করার পর আর এতদিন একসাথে থাকার পর, আপনি হুট্ করে চলে যেতে চাইলেই চলে যেতে দেবো আমি আপনাকে?

ঃ সেকি! দেবেন না?

www.boighar.com

ঃ না, কখখনো না।

ঃ না? আমাকে আর আপনার কি দরকার?

ঃ দরকার? শুধু দরকার পড়লেই থাকবেন, নইলে থাকবেন না? দুঃখের দিনে থাকবেন আর সুখের দিনে থাকবেন না?

ঃ কি করে থাকি, বলুন? আমার দিকটাও তো দেখতে হবে আমাকে? নিশ্চিন্তে থাকি কি করে?

ঃ তা আমি জানিনে। আপনাকে থাকতেই হবে– এই আমার শেষ কথা। বাবা আপনাকে যাবার অনুমতি দিলেও আমি কিন্তু দেবো না, এটা আপনাকে জানিয়ে দিলাম। একদম সাফ কথা!

–বলেই তৎক্ষণাৎ ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে সরে গেল মিস্ জেরিনা। আজিজুল হকও সেই দিকে চেয়ে রইলো বিহ্বল দৃষ্টিতে। জবাব দেয়ার কোন কথাই সে খুঁজে পেলো না তখন। পাওয়ার কথাও নয়। দীর্ঘদিন এক সাথে থেকেও বাইরের দিক দিয়ে কেউ কারো নিকটে আসেনি ঠিকই, কিন্তু ভেতরের দিক যে নিজের অজ্ঞাতেই উভয়ে উভয়ের অনেক নিকটে এসে গেছে, আজ এই বিদায় নেয়ার প্রশ্নেই যেন সেটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়লো উভয়ের কাছে।

আজিজুল হকের এই বিদায় নেয়ার প্রসঙ্গটা অবশেষে খান সাহেবের কাছে এসেও পৌঁছলো। আজিজুল হকই সে প্রসঙ্গ তার কাছে নিয়ে এলো। খান সাহেবের কাছে এসে আজিজুল হক বিনীতকণ্ঠে বললো– মুরুব্বি, আমার একটা নিবেদন ছিল।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে খান সাহেব বললেন– নিবেদন! সেকি বাপজান! আমার কাছে নিবেদন করার কি আছে তোমার? যা চাই আর যা বলার তা আমার কাছে সরাসরি বলবে তুমি। এত দ্বিধাদ্বন্দ্বের কি আছে?

আজিজুল হক বললো– বলছিলাম কি, আপনি তো এখন আপনার নিজের বাড়িতে যাবেন। এবার আমাকেও এযাযত দিন, আমার পথ ধরি। অনেকদিনই তো হলো!

ঃ তোমার পথ ধরবে, কেমন?

ঃ কথা হলো, আমাকে এবার বিদায় দিন। আপনাদের সাথে আমার থাকাটা তো আর জরুরি নয় এখন। আল্লাহর রহমে আপনি এখন সুস্থ। এবার আপনি আপনার বাড়িতে যান, আমিও আমার পথ দেখি।

ঃ ফের পথ দেখি! পথ দেখবে কি রকম? কোথায় যাবে তুমি?

ঃ যাওয়ার অবশ্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই। যেখানে কাজ করি, মানে চাকুরি করি, সেখানেই থাকি। বাড়িতে তেমন একটা যাইও না, তেমন একটা থাকিও না বাড়িতে। চাকরির জায়গাই থাকার জায়গা আমার। খুলনাতে চাকরি একটা পেয়েছিলাম। আমার জন্যে সে চাকরি হয়তো এতদিন আর নেই। নতুন একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে হবে আর কি!

ঃ নতুন চাকরি?

ঃ জি। সেই চেষ্টাতেই এখন আমাকে যেতে হবে।

ঃ আমাদের ছেড়ে? আমাদের ফেলে রেখে চলে যেতে চাও তুমি?

আজিজুল হক মাথা চুলকিয়ে বললো– জি, কথা হলো, সেই চিন্তাই করছি।

খান সাহেব এবার আহতকণ্ঠে বললেন– তাজ্জব! সেই চিন্তাটা করতে পারলে তুমি? এতো চেষ্টা করে বাঁচিয়ে তুললে আমাকে, সারিয়ে তুললে, আর এখন আমাকে আমার বাড়িতে না পৌঁছে দিয়েই তুমি চলে যেতে চাও? আমাদের কাছ থেকে একদম হারিয়ে যেতে চাও? এতটাই পারলে তুমি?

ঃ তা কথা হলো, যেতে তো একদিন হবেই মুরুব্বি। একটা দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে হঠাৎ করেই আপনাদের সাথে জড়িয়ে গেছি আমি আর সেই থেকে আপনাদের সাথে আছি। কোন পরিকল্পিত ব্যাপার নয় এটা। এভাবে তো অধিক দিন চলে না।

ঃ চলে না কেমন? কেন চলবে না? জড়িয়ে যখন গেছোই, তখন এত শিগগির আমাদের ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কারণটা কি ঘটলো? আমাদের নিয়ে তোমার কোন চিন্তা- চেতনা থাকুক আর না থাকুক, তোমার ওপর আমার কিন্তু গভীর মায়া পড়ে গেছে বাপজান! সে মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে তুমি যেতে চাইলেই কি যেতে দিতে পারি আমি, বলো?

ঃ তা হয়তো পারেন না, অর্থাৎ মন আপনার চাইছে না। কিন্তু আমি তো আর নিষ্ক্রীয় হয়ে এইভাবে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারিনে আর থাকতে পারিনে আপনাদের সাথে। আমাকে তো কাজকর্ম করে খেতে হবে আর সে কাজ জুটিয়ে নিতে হবে।

ঃ কাজ? কি কাজ?

ঃ কাজ মানে চাকরি।

ঃ কি রকম চাকরি? মোল্লা মুসল্লি মানুষ তুমি। কোন মসজিদ -মাজারের চাকরি কি? কোন ইমাম খাদেমের পদ?

ইতোমধ্যে মিস্ জেরিনা এসে হাজির হলো সেখানে। বাপের কথা শুনে জেরিনা বললো– না বাবা, কোন মাজার মসজিদে নয়। উনি একজন শিক্ষক। আপনাকে নিয়ে প্রথমে যে ক্লিনিকে গিয়েছিলাম, সেই ক্লিনিকের ডাক্তারের কাছে শুনেছি শিক্ষকতা করার জন্যেই উনি খুলনায় যাচ্ছিলেন।

উৎসাহিত হয়ে উঠে খান সাহেব বললেন– অ্যাঁ? শিক্ষক? শিক্ষকের চাকরি? তো কি হয়েছে? সে চাকরি কি আমাদের ওখানে আর আমার হাতে নেই? সেজন্যে খুলনায় যেতে হবে কেন? মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষকের পদ, হাই স্কুলের হেড মওলানার পদ- সবই আছে আমার হাতে। নিজে আমি ধর্মটর্ম তেমন একটা না মানলেও, সব স্থানেই খাতির আর প্রভাব আছে আমার। আমি চাইলেই পদ একটা দিয়ে দিবে যে কেউ।

এই সময় আর নিজের দাম বাড়ানোর ইচ্ছে হলো না আজিজুল হকের। তাই, নিজের ডিগ্রি আর চাকরির রকম নিয়ে কোন ব্যাখ্যায় সে গেল না। খান সাহেবের আবেগের মুখে সে চুপ করে রইলো।

বাপের কথার প্রেক্ষিতে মিস্ জেরিনা বললো– তাহলে সেইটেই করুন। সেইটেই জুটিয়ে দিন।

খান সাহেব বললেন– দেবোই তো। আমাদের ওখানেই চাকরি জুটিয়ে দিয়ে আমার কাছে রেখে দেবো এই ছেলেকে। এমন ছেলেকে কি ছাড়তে পারি আমি?

তার বাপমায়ের কাছে মূল্য তেমন না থাকতে পারে তার। আমি অপুত্রক, আমার কাছে মূল্য তার অপরিসীম। একেবারে ছাড়াছাড়ি হতে চাইলেই কি তা হতে দেবো?

আজিজুল হক অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ফস্ করে বলে ফেললো একেবারেই তো ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছিনে জনাব। সময় সুযোগ পেলেই আপনাদের কাছে ফের এসে হাজির হবো আমি।

সঙ্গে সঙ্গে মিস্ জেরিনা বাঘের মতো আক্রমণ করলো তাকে। বললো– ফের চালাকি? আমাদের তখন কোথায় পাবেন আপনি, শুনি? আমাদের বাড়িতে না গিয়ে এখনই কেটে পড়লে, কোথায় পাবেন ঠিকানা আমাদের? কোথায় পাবেন, বলুন?

ঠেকে গেল আজিজুল হক। সে থতমত করতে লাগলো। খান সাহেব ফের যোগ দিয়ে বললেন– কখ্খনো না, কখ্খনো না। আমাকে দেনাদার করে রেখে যেতে চাইলেই কি যেতে দেবো তাকে? ঋণশোধ করার কি সুযোগ দিতে হবে না? সাথে করে বাড়িতে নিয়ে গেলে তবেই তো সে ঋণশোধ করতে পারবো আমি। টাকা আমার সব বাড়িতে।

শক্ত ইস্যু পেয়ে গেল জেরিনা। আজিজুল হককে লক্ষ্য করে সে এবার সরবে বললো– তাইতো-তাইতো। আপনি যে আমাদের জন্যে একগাদা টাকা খরচ করলেন সে টাকা ফেরত নিতে হবেনা আপনাকে? সে টাকা না নিয়েই আপনি যাবেন কি করে? আপনাকে তো যেতেই হবে আমাদের সাথে।

আজিজুল হক জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললো– না, কথা হলো, ও টাকা আবার ফেরত নেবো কেন? একা মানুষ আমি। খরচ আমার সামান্যই। ও টাকা ফেরত নেয়ার তো খুব একটা গরজ নেই আমার। এখনো আমার সাথে যে টাকা আছে, সে টাকাই আমার জন্যে যথেষ্ট। ও টাকা আর ফেরত টেরত নেবো না।

ফুশে উঠলো জেরিনা, বললো– নেবোনা মানে? টাকাগুলো কি তাহলে খয়রাত দিলেন আমাদের? আমরা কাঙাল না মিস্কীন যে খয়রাত নেবো আপনার? বিপদে পড়ে ঋণ করেছি, সে ঋণ শোধ দেবো না আমরা? আপনি ভাবেন কি আমাদের? কারো ন্যায্য পাওনা মেরে দেওয়ার লোক নাকি আমরা?

লা জবাব হয়ে গেল আজিজুল হক। ওদিকে আবার কথার গোলমালে নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেল সে। এছাড়া, এদের বাড়িতে যাওয়ার আগ্রহ যে তার আদৌ ছিল না ব্যাপারটা তাও নয়। তাই সে চিন্তা করে দেখলো, এঁদের প্রস্তাবে রাজি হওয়াটা তার জন্য সব দিক দিয়েই উত্তম। কারণ, খুলনায় তার যেতেই হবে একবার। কলেজের চাকরিটা তার অপেক্ষায় না থাকলেও, সার্টিফিকেটগুলোর যে সত্যায়িত কপি সেখানে সে জমা দিয়েছে দরখাস্তের সাথে, সেই সত্যায়িত কপিগুলো আনতেই হবে ঐ কলেজ থেকে। তার মাদ্রাসার সার্টিফিকেটগুলো বাড়িতে থাকায় সেগুলো রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু বি.এ. আর এম.এ. পাশের

অরিজিন্যাল সার্টিফিকেট গুলো তার সাথে থাকায়, সেগুলো পুড়ে গেছে ট্রেনে। যতদিন এই সার্টিফিকেটগুলোর ডুপ্লিকেট কপি না তোলা হয় ইউনিভার্সিটি থেকে, ততদিন ঐ সত্যায়িত কপিগুলো দেখিয়েই অধ্যাপকের পদ তাকে জুটিয়ে নিতে হবে। অতএব, তাকে যেতেই হবে খুলনায় আর সেক্ষেত্রে এদের সাথে তার বাগেরহাটে যাওয়াটাই উত্তম। ওখানে থেকে খুলনা খুবই নিকটে। ওখান থেকে ঢু মেরে সে সেরে আসতে পারবে খুলনার কাজ।

একপলকে এ সবকিছু চিন্তা করে নিয়ে আজিজুল হক অবশেষে খান সাহেবদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করলো। অর্থাৎ রাজী হলো তাদের সাথে তাদের বাড়িতে যেতে। খান সাহেবরা এতে জব্বোর খুশি হলেন। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে অচিরেই একদিন তাঁরা রওনা দিলেন বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে এবং হাজির হলেন আপন গৃহে এসে।

খান সাহেবেরা এসে নিজ গৃহে হাজির হওয়ার সাথে সাথে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হলো। পুরাতন ঝি-চাকর নিয়ে বাড়িতে ছিল খান সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা মনোয়ারা বেগম মেরিনা। ক্র্যাচে ভর দেয়া বাপকে দেখেই সে আর্তনাদ করে উঠলো এবং কান্নার সাথে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। হায় হায় করতে লাগলো বাড়ির ঝি-চাকর ও উপস্থিত লোকজন। মুহূর্তেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো খবর। খান সাহেবের ভ্রাতৃদ্বয় তাদের পরিবারবর্গ ও চারপাশের পড়শীরা ছুটে এলেন খবর শুনেই। সবাই মিলে কিছুক্ষণ আহাজারি করার পর, কি করে এ দুর্ঘটনা ঘটলো তা জানার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

খান সাহেব তাঁর কান্নারত কন্যাসহ বিলাপরত চাকর-চাকরানীদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সেই ফাঁকে মিস্ জেরিনা ঘটনা সবাইকে বর্ণনা করে শোনালো। শোনার পর আবার কেউ কেউ কিছুটা হায় হুঁতাশ করলেন। জেরিনার চাচা আবেদ খান সাহেব বিরূপ নজরে আজিজুল হককে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন এ লোক? এ লোক কে?

জবাবে জেরিনা বললো– এই লোকই তো সেই লোক। নির্ঘাত মৃত্যু থেকে যে লোক বাবাকে বাঁচালেন, এই লোকই সেই লোক।

আবেদ খানের সম্বন্ধীপুত্র কামাল হোসেন মাথার টোকাই মার্কা ক্যাপটা তিনচার পাক ঘুরিয়ে ফুফার কথার খেই ধরে প্রশ্ন করলো তা এলোক এখানে কেন?

জেরিনা বললো– আমাদের, অর্থাৎ আমার বাবাকে পৌঁছে দিতে এসেছেন। পা হীন বাবাকে অতদূর থেকে আমি কি একা আনতে পারি?

একথায় ফুফা ও সম্বন্ধীপুত্র একসাথে নাখোশ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন অঁ-

টাইট গেঞ্জিপ্যান্ট পরিহিতা ছোট বড় কয়েকজন মেয়ে হ্যাঁ করে চেয়েছিল জেরিনার দিকে। এদের একজন জেরিনার প্রায় সমবয়সী জেরিনার চাচাতো বোন

মিথিলা ফারজানা। আবেদ খানের মেয়ে। জেরিনার পরনের শাড়ি-ব্লাউজের দিকে বক্র নয়নে চেয়ে মিথিলা ফারজানা প্রশ্ন করলো এ কিরে জেরিনা। একি সঙ্ সেজেছিস্ তুই। একি তোর পোশাক?

জেরিনা বললো– কেন কি হয়েছে?

মিথিলা বললো– আর কিছু না হোক, সিম্‌পল ড্রেস ছেড়ে ঐ পঞ্চাশ গজ কাপড় জড়িয়ে থাকতে তোর অস্বস্তি লাগছে না?

জেরিনা ধীরকণ্ঠে বললো– তা তো কিছুটা লাগেই। কিন্তু পরিস্থিতির চাহিদা তো পূরণ করতে হবে।

আরো বিভিন্নজন বিভিন্ন মন্তব্য আর ইশারা-ইঙ্গিত করতে লাগলো। এসব লক্ষ্য করে আজিজুল হক বুঝতে পারলো, খান সাহেবের পদচ্ছেদে সবাই এরা কমবেশি দুঃখ বোধ-করলেও জেরিনার পরনে শাড়ি-ব্লাউজ আর দাড়ি টুপিওয়ালা তাকে দেখে এরা প্রায় সকলেই খুব ক্ষুব্ধ। মেরিনার কথাতেও এদের সমর্থনের সুরই পরোক্ষভাবে বিদ্যমান।

ভিড়টা একটু পাতলা হতেই আজিজুল হক জেরিনাকে প্রশ্ন করলো স্বচেহারায় স্বজগতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা তাহলে পুরোপুরিই আছে, না কি বলেন?

মিস্ জেরিনা মুখ তুলে পাল্ট-প্রশ্ন করলো অর্থাৎ?

আজিজুল হক বললো– গেঞ্জিপ্যান্ট ধরবেন নাকি আবার? গেঞ্জিপ্যান্ট ধরে ফের স্বপরিবেশে লীন হয়ে যাবেন নাকি?

ঃ কেন, এ প্রশ্ন করছেন কেন?

ঃ শাড়ি-ব্লাউজ পরে থেকে অস্বস্তিবোধ করছেন এই কথা বললেন– কিনা?

ঃ হ্যাঁ, তা একটু করছি বই কি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

ঃ তাতেই তো হয়েছে অনেকখানি। সকলের উপহাসের সাথে এই অস্বস্তি বোধ নিয়ে কি এই পোশাকে চলতে পারবেন বেশিদিন?

জেরিনা ঢিলে কণ্ঠে বললো– চলতে কষ্ট হবে। তবু চেষ্টা করে দেখি, অভ্যস্ত হতে পারি কিনা?

ঃ না পারলে?

জেরিনা শক্তকণ্ঠে বললো– ছুড়ে ফেলে দেবো এসব। এর ওপর কি আর কথা আছে?

ঃ না, নেই। তবে দোহাই, আমার সামনে দেবেন না। আমি চলে যাওয়ার পর যা হয় তাই করবেন।

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা, সেটা দেখা যাবে। এখন যান, ঐ যে ঐ কামরাটা দেখছেন, ঐটা আপনার থাকার ঘর। এখন ওখানে চলে যান। এ্যাটাচড্ বাথরুম আছে। সম্ভব হলে গোসলটাও সেরে নেবেন।

এরপরেই জেরিনা ডাক দিয়ে বললো– মীনুর মা, এই কামরাটা এখনই একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দাও তো। বাথরুমে তেল সাবান দাও আর বেডশিটটা পাল্টিয়ে দাও।

সেদিনটা কেটে গেল। আজিজুল হক এরই মধ্যে পুরোপুরি উপলব্ধি করলো যে, ঘোর এক নাস্তিক পরিবার এটা। এ বাড়ির এবং খান সাহেবের ভাইদের বাড়ির লোকেরা একজনও নামায পড়েন না। কথাবার্তাও সব হিন্দুয়ানী। ইসলামী আদব-আখলাক করুণভাবে অনুপস্থিত। ইদানীং জেরিনার কিছু কসরত ছাড়া, ইসলামী শব্দের ব্যবহারও তাদের মুখে নেই। পানিকে জল বলতেই এরা অভ্যস্ত।

পরিস্থিতি আঁচ করে রাতের আহারের পরে আজিজুল হক জেরিনাকে বললো– দেখুন, আপনাদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে দু'চারদিন আপনাদের এখানে থাকার ইচ্ছে আমার ছিল। কিন্তু সেটা তো আর হয় না।

জেরিনা প্রশ্ন করলো কেন-কেন?

ঃ আপনি তো জানেন, আপনাদের মতো আমি নাস্তিক নই, আমি আস্তিক মানুষ। আমি মুসলমান। কোন বেনামাযির হাতের খানা খাওয়াটা চলে না আমার।

ঃ এতদিন তো খেলেন।

www.boighar.com

ঃ সেটা বেকায়দায় পড়ে খেয়েছি।

ঃ এখনই বা কায়দার কি আছে এমন? আমরা যেতে না দিলে আপনি যাবেন কি করে?

ঃ দরকার হলে পালিয়ে যাবো।

ঃ হ্যাঁ, সে ভয়টা আমার সব সময়ই আছে। তবে পালাতে আপনাকে হবে না। কারণ বেনামাযির হাতের খানা আপনি খাচ্ছেন না। খানা পাকায় মীনুর মা। সকলের সকল বাধা, সকল উপহাস উপেক্ষা করে সে নামায পড়ে পাঁচওয়াক্ত আর রোযাও রাখে সবগুলো। তাকে তাড়াতে চেয়েও তাড়াতে আমরা পারিনি। কারণ এমন ঈমানদার আর বিশ্বাসী ঝি এ যাবৎ আমরা একজনও পাইনি।

ঃ সে কি! আপনাদের স্বগোত্রেও নয়? অর্থাৎ আপনাদের নাস্তিক পরিমণ্ডলেও পাননি?

ঃ না। ঝি পেয়েছি শত শতই। কিন্তু সবগুলো বেঈমান আর চোর।

ঃ তাই এই ঈমানদার আর নামাযি ঝি রেখেছেন? স্বগোত্রের সকল উপহাস উপেক্ষা করে?

ঃ রাখতেই হবে। নিরাপত্তাটা তো সবার আগে প্রয়োজন।

ঃ সাব্বাস! এই সত্যটা কেন যে বুঝেও বুঝেন না আপনারা সেইটেই দুঃখ।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ঈমানদার হতে হলে আল্লাহভীতির প্রয়োজন বুঝেছেন?

ঈষৎ হাসি মুখে জেরিনা বললো– জি-জি, বুঝেছি। আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। রাত হয়েছে, এবার যান। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

পরের দিন সকালেই আজিজুল হকের আবার বিস্ময়ের অবধি রইলো না। আঁটশাঁট করে শাড়ি পরে চোখে গগলস এঁটে ঠোঁটে রঙ লাগিয়ে, ডানহাতে ঘড়ি

বেঁধে এবং ঐ রকম একটা টোকাইমার্কা ক্যাপ মাথায় দিয়ে জেরিনা এসে হাসি-মুখে তার সামনে দাঁড়ালো। কিছু খাতাপত্র বগলে। এ বেশে তাকে দেখে আজিজুল হক হাঁ করে চেয়ে রইলো তার দিকে। জেরিনা ফের হেসে বললো– কি দেখছেন?

আজিজুল হক বললো– এ বেশে কোথায় চললেন আপনি?

ঃ সামনের এই কে.জি. স্কুলে।

ঃ মার কাটারি! এই বয়সে আপনি কে.জি. স্কুলে পড়তে যান?

ঃ না, কে.জি. স্কুলে পাড়াতে যাই।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আমি সেখানকার শিক্ষিকা।

ঃ বলেন কি! আপনার লেখাপড়া?

ঃ গত বছর বি.এ. পাস করেছি।

ঃ মাই গুডনেস্!

ঃ কি হলো?

ঃ আপনি বি.এ. পাস মহিলা আর কে.জি. স্কুলের শিক্ষিকা?

ঃ সেই কথাই তো বলছি।

ঃ অথচ এই বেশে পড়াতে যান ওখানে? এই হ্যাট ক্যাপ পরে?

ঃ হ্যাঁ, এগুলোই ওখানে চলে বেশি।

ঃ তাজ্জব! চলে বেশি বলে আপনিও তাই পরবেন? পরিবর্তন হলো না আপনার কিছুই?

ঃ দেখুন, গেঞ্জিপ্যান্ট ছেড়ে শাড়ি ব্লাউজ পরেছি। এত তাড়াতাড়ি সবকিছু এক সাথে ছেড়ে দেই কি করে? ছাড়লে আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে। অন্যের দৃষ্টিকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে তো।

ঃ ওখানকার অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বুঝি এই সবই পরেন?

ঃ বিলকুল। শাড়ি-ব্লাউজ কদাচিৎ কেউ পরেন। সালোয়ার কামিজ উড়নার একদম প্রবেশ নিষেধ ওখানে।

ঃ ছাত্রছাত্রী সবাই বুঝি নাস্তিক পরিবারের?

ঃ অধিকাংশই। বাদ বাকিরা নাস্তিক না হলেও প্রগতিশীল অগ্রসর পরিবারের ছেলেমেয়ে। নামাযি ঘরের তেমন একটা কেউ নয়। অগ্রসর মানুষ বোঝেন? বাঁধাবন্ধনহীন গো এ্যাজ ইউ লাইক এবং ডু এ্যাজ ইউ লাইক।

ঃ মা'শাআল্লাহ। তাই আপনি এই সাজে সেজেছেন?

ঃ সাজতেই হবে। আপনি চলে গেলে তো এদের মাঝেই আর এদের নিয়েই থাকতে হবে আমাকে। একা আমি ভোল্ পাল্টিয়ে করবো কি?

ঃ তা বটে তা বটে।

জেরিনা বেরিয়ে গেলে তখনই এক ফাঁকে খুলনায় রওনা হলো আজিজুল হক। খুলনার সেই নির্দিষ্ট কলেজটিতে এসে সে দেখলো, তার ধারণাই ঠিক। যোগদানে তার দেরি হওয়ায় দ্বিতীয় ক্যান্ডিডেট, অর্থাৎ নেকস্ট চয়েসকে নিয়োগ দান করা হয়েছে। অগত্যা, সার্টিফিকেটগুলোর সত্যায়িত কপি সংগ্রহ করে নিয়ে ঐদিন ফের জেরিনাদের বাড়িতে ফিরে এলো আজিজুল হক। দিনের দিন ফিরে আসায় তার অনুপস্থিতির ব্যাপারে তাকে অধিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো না।

ঐদিনই রাত্রিকালে জেরিনার আব্বা জাবেদ খান সাহেব আজিজুল হককে জোর দিয়ে জানালেন, চাকরির জন্যে কোথাও তার ছুটোছুটি করতে হবে না। স্থানীয় হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষের সাথে কথা হয়েছে তাঁর। তাঁরা বলেছেন, ক্লাস টেন পর্যন্ত ইসলামিয়াত আর আরবী পড়াতে পারলে আর কথা নেই। দিন তিনেক পরেই বর্তমান মৌলবি শিক্ষক নিজ এলাকায় চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি চলে গেলেই তাঁর স্থলে তাঁরা নিয়ে নেবেন আজিজুল হককে।

শুনে আজিজুল হক খোশদিলেই সম্মতি দিলো তাতে। সে ভেবে দেখলো, শূন্যের উপর ছুটোছুটি করার চেয়ে এখানে স্থির হয়ে থেকে চাকরি বাকরির খোঁজ করাটাই উত্তম। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলে কলেজ-ভার্সিটি যেখানেই হোক ঘরে বসে পাওয়া যাবে চাকরি। ডিগ্রির মান দেখলে কেউ তাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। যে কয়দিন তা না পাওয়া যায়, সে কয়দিন ঐ হাই স্কুলই জিন্দাবাদ

জিন্দাবাদ দিয়ে সেখানেই সে থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা নিলেও আজিজুল হক নিরাপদে জেরিনাদের গৃহে থেকে যেতে পারলো না। বিঘ্ন বিপত্তি ও জুট-ঝামেলা ঘটতে লাগলো প্রায়শঃই। সেদিনের পরের দিন সকালেই গেঞ্জিপ্যান্ট পরিহিতা জেরিনার চাচাতো বোন মিথিলা ফারজানা এসে আজিজুল হককে দেখেই যারপর নেই বিস্মিত হলো। আজিজুল হকের পাশ কাটিয়ে গিয়ে সে জেরিনাকে প্রশ্ন করলো সেকিরে। এলোক যে এখনো এখানে? কি ব্যাপার! বিদায় করে দিস্‌নি এখনো?

জেরিনাও বিস্মিত কণ্ঠে বললো– বিদায় করবো কি রকম? সবে পরশুদিন দুপুরে ইনি আমাদের সাথে এলেন। মাঝে একটা দিন মাত্র গেছে। এরই মধ্যে এতবড় একজন উপকারী লোককে বিদায় করবো মানে? কত সেধে যেচে এনেছি এঁকে, জানিস?

ঃ আমার জেনে কাজ নেই। উপকার করেছে টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করে দে। বাড়িতে একজন রাজাকার-আলবদরকে থাকতে দেখলে, লোকে বলবে কি? ভদ্র সমাজে কি ঠাঁই পাবি তুই? অগ্রসর মানুষেরা কি আর মানুষ বলবে তোকে?

ঃ না বলে, না বলুক। তুই চুপ কর।

ঃ তার অর্থ? তুই পরোয়া করিসনে অগ্রসর মানুষদের?

ঃ পরোয়া করবো কি। তোর আমার হিসেবের অর্থাৎ আমাদের পরিমণ্ডলের হিসাবে অগ্রসর মানুষ মানেই তো ধর্ম না মানা, লীভ টু গেদার করা আর মদ-গাঁজা খাওয়া মানুষ। এরা এমন কি মহানজন যে এদের পরোয়া করতে হবে।

ঃ এ তুই কি বলছিস্? মদ-গাঁজা যা-ই থাক, এরা আমাদেরই নিজের মানুষ। এদের পরোয়া না করে তুই অপর মানুষ এক রাজাকারকে ঠাঁই দিবি ঘরে? ছিঃ ছিঃ। এমন কাজ করিসনে আজই একে শিগগির শিগগির বিদায় করে দে।

ঃ আহ্! চুপ কর। উনি শুনতে পেলে কি ভাববেন, বলতো?

ঃ বলাবলির কি আছে? একজন স্বাধীনতার শত্রু মৌলবাদী কি ভাবলো না ভাবলো এটা কি কোন পরোয়া করার বিষয়? বরং এসব লোক বাড়িতে থাকলে যেকোন সময় এরা যেকোন বিপদ ঘটিয়ে তুলতে পারে- এটা কেন ভাবছিস্নে?

ঃ আমার ভেবে কাজ নেই। তোর অন্য কথা না থাকলে, তুই এখন যেতে পারিস।

ঃ যাবো তো অবশ্যই। আমি কি তোদের বাড়িতে থাকতে এসেছি? আমি শুধু জানতে চাইছি, এসব অনগ্রসর বুনো মানুষদের নিয়ে তোর কি কোন ভয় নেই?

ঃ এক বিন্দুও না।

ঃ বলিস কি? এসব বন্য মানুষদের নিয়ে তোর একবিন্দুও ভয় নেই?

ঃ না, নেই। বরং ভয় আছে আমাদের এই প্রগতিবাদী সমাজের মুখ সর্বস্ব সভ্য মানুষদের নিয়ে। ভয় আছে তোর মামাতো ভাই কামাল হোসেনদের মতো অগ্রসর মানুষদের নিয়ে। যারা ধর্মাধর্ম মানে না, তারা করতে পারে না, এমন কাজ নেই।

গালে হাত দিয়ে মিথিলা ফারজানা বললো– ওম্মা! তোর হলো কি বলতো? তুই যে মৌলবাদীদের মতোই কথা বলতে শুরু করলি? এর কারণ কি?

ঃ জানিনে। মনে হচ্ছে একটু একটু করে আমার চোখ খুলতে শুরু করেছে। আমি চিনতে পারছি আমাদের।

ঃ জেরিনা!

ঃ তুই এখন আয়, আমার কাজ আছে।

ঃ যাচ্ছি-যাচ্ছি। তবে যা ভেবেছিলাম, তা দেখছি একদম সত্যি।

ঃ ভেবেছিলি! কি ভেবেছিলি?

ঃ ঐ সুন্দর চেহারা খানাই ডুবিয়েছে তোকে। ঐ চমৎকার মুখখানই তোকে গিলে খেয়েছে আগাগোড়া।

ঃ মিথিলা!

ঃ মৌলবাদী হলে কি হবে, চেহারাটাতো যেকোন মেয়ের মাথা বিগড়ে দেয়ার মতো। এতদিন ধরে এই লোকের সাথে আছিস তুই। তোর মাথা কি আর বিগড়ে না গিয়ে পারে?

ঃ খবরদার। কি বলতে চাস তুই?

ঃ বলবো আর কি! মরলি তো ঐ সুন্দর মুখখানা দেখেই মরলি? জায়গা-অজায়গা দেখলি না?

ঃ তবেরে–

তেড়ে এলো জেরিনা। "মর-মর, ডোবায় ডুবে মর" বলে টিপ্পনী কাটতে কাটতে দৌড়ে পালিয়ে গেল মিথিলা।

মিথিলা কোন রাখঢাক না রাখায় এদের সব কথা শুনতে পেলো আজিজুল হক। তাই মিথিলা চলে যেতেই আজিজুল হক এসে জেরিনাকে প্রশ্ন করলো মেয়েটা কে?

জেরিনা বললো– কোন মেয়ে? এই যে এখনই দৌড়ে চলে গেল, ঐ মেয়েটা?

ঃ জি-জি।

ঃ ওটা আমার চাচার মেয়ে। আবেদ খান চাচার মেয়ে। বরাবরই ও বড় বাচাল।

ঃ হুঁ! পয়লাদিন এসেই একে দেখেছিলাম। সেদিনই এর হাবভাব দেখে বুঝেছিলাম বড় সুবিধের মেয়ে হবে না এটা। নাম কি এর?

ঃ মিথিলা ফারজানা।

ঃ মিথিলা ফারজানা? যাঃ ব্বাবা! এ যাবৎ মুসলমান নামের সাথে হিন্দু নাম গ্রাফটিং করা দেখেছি। হিন্দু নামের সাথে মুসলমান গ্রাফটিং করা দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। এমন খিচুরি না পাকিয়ে শুধু ঐ হিন্দু নামটুকু রাখলেই তো ভাল হতো।

ঃ তাই নাকি?

ঃ খুবই প্রগতিবাদী মেয়ে বুঝি? অতি অগ্রসর মেয়ে?

জেরিনা মৃদু হেসে বললো– অতি-অতি। খুব সাবধান থাকবেন ওর ব্যাপারে। বেসামাল হলেই কিন্তু ফাঁসিয়ে দেবে আপনাকে।

আজিজুল হকও হেসে বললো– আল্লাহ ভরসা।

স্থানীয় ঐ হাই স্কুলেই মৌলভি শিক্ষকের পদে যোগদান করলো আজিজুল হক। পরীক্ষামূলক চাকরি। ভালভাবে আরবী পড়াতে পারলে, কায়েমী হবে চাকরিটা। সার্টিফিকেট দাখিল করার দরকার হবে তখন। আজিজুল হকের সময় কাটানোর প্রয়োজন। তার উপর তার ঘাটতি নেই কোন দিকেই। সার্টিফিকেটও আছে তার বাড়িতে, যোগ্যতাও আছে তার প্রয়োজনের ওপর। তাই খোশদিলে ঐ চাকরিতেই যোগদান করলো আজিজুল হক।

চাকরিতে যোগ দেয়ার দিন দু'য়েক পরে টাকার একটা মোটাবাণ্ডিল নিয়ে জেরিনার পিতা জাবেদ খান সাহেব এসে আজিজুল হকের মুখোমুখি বসলেন।

সঙ্গে নিয়ে এলেন কন্যা জেরিনাকেও। আজিজুল হক বিস্মিত নেত্রে চাইতেই টাকার বাণ্ডিলটা আজিজুল হকের দিকে এগিয়ে দিয়ে খান সাহেব বললেন– নাও বাপজান, এই টাকা কয়টা রাখো।

কিছুটা বুঝতে পারলেও আজিজুল হক প্রশ্ন করলো টাকা! কিসের টাকা?

খান সাহেব বললেন– সেকি বাবাজি! এত শিগগির ভুলে গেলে? হাওলাতি টাকা। তোমার কাছে আমরা যে ঋণ নিয়েছিলাম, সেই টাকা। আমার চিকিৎসার ব্যাপারে তুমি তো ঋণ দিয়েছিলে?

ঃ ঋণ! একি বলছেন মুরুব্বি। কোন নগদ টাকা তো ঋণ আমি দেইনি? আমি তো আমার নিজের ইচ্ছায় নিজে খরচ করেছি মুরুব্বি। একে ঋণ বলছেন কেন?

ঃ নিজের ইচ্ছায়?

ঃ জি মুরুব্বি, জি।

জেরিনা এই সময় বিব্রতকণ্ঠে বললো– কি সব সময় "মুরুব্বি মুরুব্বি" করছেন? বাপের বয়সী না হলেও আমার বাবা তো আপনার চাচা বয়সী হবেনই নির্ঘাত। তাঁকে আপনি কাকা বা চাচা বলতে পারেন না?

কথা ধরে খান সাহেব উৎসাহে ভরে বললেন– ঠিক-ঠিক, তুই ঠিক বলেছিস মা। অনেকদিন হলো– আমরা এক সাথে আছি। একে অন্যের অনেক নিকটে এসে গেছি। এখন বাবাজির এই মুরুব্বি ডাক আর ভাল লাগে না আমার। ও ডাকে কেমন যেন পরপর লাগে। দূরের মানুষ মনে হয় নিজেকে। এখন থেকে তুমি আমাকে ঐ কাকা বা চাচা বলেই ডাকবে বাপজান। বলবে চাচা মিয়া।

আজিজুল হক খুশি হয়ে বললো– এযায়ত দিচ্ছেন?

খান সাহেব বললেন– বিলকুল-বিলকুল। তবেই না আপন বলে মনে হয় পরস্পরকে।

ঃ জি-জি, এ কথা আমারও মনে হয়েছে অনেকবার। যে কারণেই হোক, আপনাদের সাথে এতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের পর ভাবতে কষ্ট হয় আমারও।

ঃ গুড্। একসেলেন্ট! এই কথাটাই তো তোমার মুখ থেকে চাইছি আমি বাপজান।

জেরিনা আবার কথার মধ্যে বললো– আপনি চাইলেই কি হবে? এ কথাটা তো উনার মনের কথা নয়।

খান সাহেব বললেন– নয়? কেন-কেন?

জেরিনা বললো– মনের কথাই যদি হবে, তাহলে আমি তো উনার অনেকটা ছোটই হবো। উনার ছোট বোনের মতো আমি। তবু উনি আজও আমাকে সমানে "আপনি-আপনি" করে চলেছেন। এটা কি আপন করে নেয়ার লক্ষণ? ছোট বোনকে 'তুমি' না বলে 'আপনি' বলে কেউ?

ফের খান সাহেব উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। বললেন– তাইতো-তাইতো! সেকিরে বাপু? এখন থেকে ওকেও 'আপনি' বলবে না আর। 'তুমি' বলে সম্বোধন করবে, বুঝলে?

আজিজুল হক বললো– তা বলতে আমার আপত্তি নেই চাচা মিয়া, কিন্তু বিপত্তি আছে বিস্তর। আমার মতো একজন অনগ্রসর মানুষ মিস্ জেরিনার মতো একজন প্রগতিশীলা মহিলাকে "তুমি" বলতে দেখলে, আপনাদের এই প্রগতিবাদী অগ্রসর সমাজ সহ্য করতে পারবে তো?

খান সাহেব একটু নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ, তা একটু অসহ্য তাদের লাগবে বৈ কি! দুই চারদিন দুই চার কথা বলতেও পারে। কিন্তু বলুক তারা। তাতে কি এসে যায়? বলতে বলতে একদিন থেমে যাবে সবাই। সয়ে যাবে আপ্‌ছে আপ্।

জেরিনা বললো– হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নতুন কিছু সবাই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু দুই চার দিন পর নিজের অজ্ঞাতেই সবাই মেনে নেয় সবকিছু।

খান সাহেব বললেন– রাইট-রাইট। কি বাবাজি, রাজি?

আজিজুল হক বললো– ঠিক আছে। প্রথম প্রথম হোঁচট খাবো আমিও। তবু আপনি যখন বলছেন, আমি চেষ্টা করে দেখবো।

ঃ নাইস্! নাও বাবা এবার টাকা কয়টা তুলে রাখো। ফেরত দিতে একটু দেরি হলো এই আর কি!

ঃ সে কি চাচা মিয়া। আপন বলেই যদি ভাবতে চান। তাহলে আর সে টাকা ফেরত দেবেন কেন?

ঃ কেন দেবো না বাপজান? ঋণ ঋণই। সেটা আপনজনের কাছেই হোক আর অপরের কাছেই হোক। ঋণশোধ করা তো ফরজ কাজ। পরকালে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না?

ঃ সোবহানআল্লাহ! একি কথা বলছেন চাচা মিয়া? আপনি পরকালে বিশ্বাস করেন?

ঃ করি বাপজান, মনে মনে ঠিকই করি। শুধু আমাদের এই মা-মণিদের জন্যে মুখে তা স্বীকার করতে পারিনে।

ঃ আপনার এই মা-মণির ভয়ে?

ঃ না, মা-মণির একার ভয়ে নয়। মা-মণি একটা উদাহরণ আর কি। পারিনে আমার আত্মীয়স্বজন আর আমাদের সমাজের লোকজন এদের সবার ভয়ে। এদের মধ্যে থেকে তো আর পৃথকভাবে চলতে পারিনে আমি।

ঃ তাহলে এদের মধ্যে আর থাকেন কেন চাচা মিয়া? বেরিয়ে আসুন এই অন্ধকার থেকে। আলোর জগতে আসুন।

ঃ তা আর সম্ভব নয় বাপজান। আগে হলে হয়তো সাহস পেতাম অনেকটা। এখন আমি পঙ্গু। আমার আত্মীয়স্বজন আর আমার সমাজের লোকদের ওপর নির্ভর করেই এখন বেঁচে থাকতে হবে আমাকে। সে সুযোগ হয়তো আর পাবো না।

ঃ চাচা মিয়া!

ঃ অদৃষ্টের জোরে সুযোগ যদি আসে, তখন সেটা ভেবে দেখবো। এখন তুমি টাকা কয়টা তুলে রাখো বাপজান। তোমার ঋণশোধ করবো বলে ওয়াদা করেছি আমি। সুদে-আসলে শোধ করার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু সুদটা আর দিতে পারছিনে এক্ষণে। তুমি আসলটা গ্রহণ করো।

টাকার বাণ্ডিল ফের তুলে ধরলেন খান সাহেব। আজিজুল হক তবুও ইতস্তত করতে থাকলে, মিস্ জেরিনা ধমকের সুরে বললো– তবু গড়িমসি করছেন কেন? কথার বরখেলাপ করতে কি বাধ্য করবেন বাবাকে?

অগত্যা আজিজুল হক মুখ তুলে বললো– কত আছে এই বান্ডিলে?

খান সাহেব বললেন– পনের হাজার বাপজান।

আজিজুল হক চমকে উঠে বললো– সেকি! এত টাকা কেন?

ঃ জেরিনা মা'র সাথে বসে আমরা মোটামুটি হিসাব করে দেখলাম, দুই হাসপাতালে চাহিদাসহ অন্যান্য খরচ মেটাতে এই রকম টাকাই লেগেছে তোমার।

ঃ না-না, মোটেই এত টাকা লাগেনি। আমার তহবিলের হিসাব তো আমার কাছেই আছে। মোটেই এত টাকা লাগেনি। সাকুল্যে হাজার বারো টাকা খরচ হয়েছে আর তার মধ্যে আমার কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে হাজার দুই তো জোরেই লেগেছে। পনের হাজার টাকা হবে কেন?

ঃ তা না হয়, না হোক বাবাজি। আমি সুদে-আসলে দিতে চেয়েছি, বাড়তি টাকাটা সুদ হিসেবে নেও।

ঃ তওবা-তওবা! একি বলছেন চাচা মিয়া? আমি মুসলমান। সুদ আমার জন্যে হারাম। আমি সুদ নেবো কেন?

খান সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, সেও তো একটা কথা বটে। তাহলে তুমিই বলো বাপু, কত টাকা দেবো। ঐ বারো হাজার দেবো কি?

ঃ কি মুস্কিল! একান্তই কি দিতে চান আপনি?

ঃ চাই মানে কি? এই টাকা তুমি না নিলে আমি ঘুমুতে পারবো না।

ঃ বেশ, এতই যখন দিতে চান, দশহাজার টাকা দিন। যদি ঋণ বলেন, ঐ দশহাজার টাকাতেই ঋণটা ষোল আনাই শোধ হবে আপনার। এর অধিক একটা টাকা দিলেও আমি নেবো না।

www.boighar.com

আরো কিছুটা পীড়াপীড়ি করার পর খান সাহেব তাই-ই করলেন অগত্যা। বাণ্ডিল থেকে গুনে দশহাজার টাকা বের করে আজিজুল হককে দিলেন। টাকা

নিয়ে আজিজুল হক পকেট থেকে একটা রঙিন রুমাল বের করলো এবং তাতে ঐ টাকাগুলো পোঁটলা করে বাঁধলো। এরপর টাকার ঐ পোঁটলাটা জেরিনার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো– নিন তো, সরি, নাও তো, টাকাগুলো তোমার কাছে রাখো তো। আমার যখন দরকার হবে, আমি চেয়ে নেবো।

জেরিনা বললো– সেকি! আমি রাখলে, সে টাকা আপনার নেয়া হলো কি করে?

ঃ কেন হলো না? আমার টাকা তোমাকে রাখতে দিচ্ছি মাত্র। আমার রাখার জায়গা নেই, তাই। খোলা জায়গায় রাখলে তো চুরি হয়ে যাবে টাকাটা।

খান সাহেব সমর্থন দিয়ে বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক কথা। নির্ঘাত চুরি হয়ে যাবে। তুই টাকাগুলো নিয়ে গিয়ে তোর আলমারিতে তুলে রাখ। যখন চায়, তখন দিস।

শেষ হলো কথা। টাকার পোঁটলা নিয়ে জেরিনা তার নিজের ঘরে চলে গেল।

অতঃপর দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। কোন উপদ্রব ছিল না। কিন্তু বেশ কেটে যেতে দিলো না এক প্রেমের আতিশয্য। জেরিনার বা আজিজুল হকের নয়, সে আতিশয্য মিথিলা ফারজানার।

শুধু পুরুষ মৌমাছিরাই মধু আহরণে নতুন ফুলে বসে না, মক্ষীরানীরাও বসে। নতুন ফুলের সন্ধান পেলে আর অনগ্রসর বলে যতই গালাগালি করুক না কেন, আজিজুল হকের মনোরম চেহারা দেখে প্রথমদিন থেকেই মিথিলা ফারজানা তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। দিনে দিনে মিথিলার সে আকর্ষণ বেড়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। ইশারায়-ইঙ্গিতে নানাভাবে প্রেম নিবেদন করেও যখন আজিজুল হকের দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ পেলো না, ইশকের আধিক্যে তখন পরোক্ষ পথ ছেড়ে প্রত্যক্ষ পথ অবলম্বন করলো মিথিলা।

মিথিলার ব্যাপারে জেরিনা একদিন আজিজুল হককে বলেছিল খুবচ সাবধানে থাকতে। অন্যথায় মিথিলা ফাঁসিয়ে দিতে পারে তাকে। সেই কথা শোনার আর মিথিলার ইশারা-ইঙ্গিত লক্ষ্য করার পর থেকে আজিজুল হক খুব সাবধানেই ছিল। কিন্তু তা সত্বেও মিথিলা একদিন ফাঁসিয়ে দিলো তাকে।

আজিজুল হক তার ঘরের মধ্যে খাটে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। জেরিনা ও তার আব্বা তখন বাইরে ছিলেন। ঝিকে নিয়ে মেরিনা ছিল রান্না ঘরে। চারদিকে চাইতে চাইতে সেই ফাঁকে আজিজুল হকের ঘরের কাছে চুপি চুপি চলে এলো মিথিলা এবং ঢুকেই "মাই ডার্লিং" বলে সে অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়লো আজিজুল হকের কোলের উপর এবং দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরে আজিজুল হকের গালে সে উপর্যুপরি চুমা খেতে লাগলো।

আকস্মিক এই ঘটনায় চমকে উঠলো আজিজুল হক। ঘটনাটা বুঝতে পেরেই "তওবা-তওবা, একি-একি?" বলে সে মিথিলাকে কোল থেকে নামানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু মিথিলা তাকে এমন শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রইলো যে, আজিজুল

হক সহজে তাকে নামিয়ে দিতে পারলো না। অবশেষে সকল শক্তি প্রয়োগ করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আজিজুল হক এবং সজোরে ধাক্কা মেরে মিথিলাকে ফেলে দিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে।

ধাক্কা খেয়ে মিথিলা এসে খাটের নিচে পড়লো। তার মাথাটা এসে বাড়ি খেলো খাটের খুঁড়ার সাথে। এতে করে তার কপালের খানিকটা কেটে গেল এবং সেখান থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে বন্য বাঘিনীর মতো মিথিলা ফারজানা হিংস্র হয়ে উঠলো। একটানে গায়ের গেঞ্জিটার বুকের কাছের অংশটা ছিঁড়ে ফেলে সে চিৎকার জুড়ে দিলো বাঁচাও, বুনো রাজাকার আমার ইজ্জতের উপর চড়াও হয়েছে, আমাকে বাঁচাও

তার চিৎকার শুনে যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটে এলো। ছুটে এলো বাড়ির চাকর-বাকর। এই সময় বাড়ি ফিরলেন খান সাহেব ও জেরিনাও। মিথিলার অবস্থা দেখে সবাই ব্যাপার কি জানতে চাইলে, মিথিলা-ইনিয়ে বিনিয়ে বললো– "এই শুনো তো" বলে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে ঐ বনো মানুষ রাজাকার আমার ইজ্জত মারার জন্যে হিংস্র পশুর মতো আমার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল। আমি প্রাণপণে বাধা দেয়ায় সে আমার এই অবস্থা করেছে।

অভিযোগ গুরুতর। খবর পেয়ে ছুটে এলেন মিথিলাদের বাপ আবেদ খান ও মিথিলার মামাতো ভাই কামাল হোসেন। এসেই তারা "ফাটাও ঐ রাজাকারকে" বলে তারা আজিজুল হককে আঘাত করতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে "খবরদার" বলে আওয়াজ দিয়ে জেরিনা এসে উভয় পক্ষের মাঝখানে দাঁড়ালো। বললো– বিনা অপরাধে এর গায়ে হাত তুললে আপনাদের আমি ফাটক খাটিয়ে ছাড়বো।

সেই সাথে বাড়ির চাকর-বাকরও বাইরে থেকে আগত কয়েকজন স্থানীয় যুবক এসে রুখে দাঁড়িয়ে বললো– ফাটক খাটানোর আগেই এঁদের হাড়গোড় ভেঙ্গে ছাতু করে দেবো আমরা। কি ভেবেছে এঁরা? একজন নিরপরাধ লোককে একা পেয়ে মারবে আর আমরা চুপ করে তা দেখবো?

থমকে গেলেন আবেদ খান সাহেবেরা। আবেদ খান সাহেব প্রশ্ন করলেন– নিরপরাধ! মিথিলা যা বলছে তা মিথ্যা?

মিস্ জেরিনা সরোষে বললো– একশোবার মিথ্যা। আপনার মেয়েকে কি আপনি চেনেন না?

স্থানীয় যুবকেরা সঙ্গে সঙ্গে বললো– উনি না চিনলেও আমরা তো তার মেয়েকে চিনি। তার চরিত্র যে কতটা চটকদার তা জানতে আর বাকি নেই কারো। পাড়াটা মাতিয়ে তুলেছে ও একাই।

কামাল হোসেন বললো– আর ঐ মৌলবাদীর চরিত্রটা কি তাহলে উত্তম?

জেরিনা বললো– এতটাই উত্তম যে, এমন সৎচরিত্রের লোক আপনাদের মতো হাজারটা অগ্রসর মানুষের মধ্যে একটাও পাওয়া যাবে না। এতদিন আমি

তার সাথে থাকলাম আর আমি জানিনে? আপনারা চলে যান এখান থেকে। আমার বাড়িতে এসেছেন আমার মেহমানের ওপর হামলা করতে? বাড়াবাড়ি করলে আমি থানায় খবর দিতে বাধ্য হবো।

জেরিনাকে কমবেশি ভয় করে জেরিনার চাচাসহ অনেকেই। কারণ জেরিনার চরিত্র যেমনই নির্মল তেমনই সে সত্যবাদী আর তেজস্বী মেয়ে। মিথ্যা বলার লোক সে কখনো নয়। আবার অন্যায়কারীকে বিনা প্রতিবাধে ছেড়ে দেয়ার লোকও সে নয়। আবেদ খান সাহেব এবার কামাল হোসেনকে বললেন– আচ্ছা, তাহলে চলো, আমরা আপাততঃ ফিরে যাই। ঘটনাটা কি, পরে আরো খোঁজখবর নিয়ে দেখি। চলো–

আবেদ খানের ওপর ততটা না হলেও কামাল হোসেনের ওপর উপস্থিত লোকজন খুব গরম হয়ে উঠায় বিপদের গন্ধ পেলো কামাল হোসেন। নিজের চরিত্রগুণে তার ওপর যে এরা কেউ তুষ্ট নয়, কামাল সেটা জানতো। তাই আর উচ্চবাচ্য না করে "চলুন" বলে আগেই কেটে পড়লো সে। তার পিছে পিছে কেটে পড়লেন মিথিলার বাপও। মিথিলার আর কোন খবরই তারা করলেন না।

মিথিলার খবর করলো জেরিনা। তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে জেরিনা শক্তকণ্ঠে বললো– এতবড় ডাহা মিথ্যা কথা বলতে গেলি কেন? এতে কি তোর চরিত্রের মাহাত্ম্য বাড়লো, না যে টুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও গেল? লাভটা কি হলো, বল?

মিথিলা মিন্ মিন্ করে বললো– কেন, আমার কথা কি তুই বিশ্বাস করছিস নে?

ঃ না, এক বিন্দুও না। বিশ্বাস করবো কি করে? গভীর রাতে এক বিছানায় এক সাথে শুয়ে থাকার পরও এই লোক আমার প্রতি এতটুকু প্রেমাসক্ত হয়নি। আমি কি তোর চেয়ে কম সুন্দরী, না আমার চেহারা তোর চেয়ে কম আকর্ষণীয়? এক বিছানায় পেয়েও যে লোক এতটুকু অসম্মানজনক আচরণ আমার প্রতি করলো না, সেই লোক তোকে দিনে-দুপুরে ডেকে এনে জোর করে তোর ইজ্জতহানী করতে গেল?

ঃ তা মানে, কথা হলো–

ঃ দ্যাখ্ মিথিলা তুই তো জানিস তোর সব গোপনকীর্তি জানা আছে আমার। তবু কেন মিথ্যা বলতে চাইছিস? বেশি চালাকি করলে কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো আমি।

আস্তে আস্তে নুয়ে পড়লো মিথিলার মাথা। এবার সে মিনতি করে বললো– আমাকে মাফ করে দে জেরিনা। হঠাৎ আমার মাথায় ভূত চেপে গিয়েছিল বলেই আমি এই অন্যায় করে ফেলেছি। কথা দিচ্ছি, এমনটি আর কখনো করবোনা।

ঃ অর্থাৎ, তুই নিজেই গিয়ে চড়াও হয়েছিলি তার উপর?

ঃ হ্যাঁরে! কি যে দুর্মতি হলো! আর এমনটি করবো না।

ঃ ঠিক?

ঃ একদম ঠিক। এখন থেকে এ লোককে আমি গুরুর মতো শ্রদ্ধা করবো রে। বাপরে! এত শক্ত চরিত্র এর। কিছুতেই টলাতে এঁকে পারলাম না। কতদিন ধরে এর পেছনে লেগে আছি আমি, তবু–

জেরিনা বললো– তবুও টলাতে একে পারলিনে?

ঃ ঠিক তাই।

ঃ এবার এর সাথে তোর ঐ কামাল ভাই আর তার সঙ্গীদের চরিত্র মিলিয়ে দ্যাখতো! খেয়াল করে দ্যাখতো, তুই সুযোগ না দিতে চাইলেও, সুযোগ নেয়ার জন্যে তারা কেমন হন্যে হয়ে উঠে?

ঃ ওরে বাপরে! সে কথা উঠলে বলবো, ইনি সাক্ষাৎ দেবতা আর ওরা সাক্ষাৎ শয়তান। বেকায়দায় পেয়ে ওরা কতবার যে আমার–

ঃ থাক-থাক, বলতে হবে না। এবার বুঝে নে, আমাদের এইসব প্রগতির ফেরিওয়ালাদের চরিত্র আর তার পাশে এই সব ধর্মভীরু মৌলবাদীদের চরিত্র।

ঃ ঠিক-ঠিক। তুই ঠিকই বলেছিসরে জেরিনা। আজকের এই ঘটনাটা না ঘটালে, এই পার্থক্য কোনদিনই ধরতে পারতাম না আমি।

এ নিয়ে আর কোন ঝুট্‌ঝামেলা হলো না। আজিজুল হকের সামনে এ ঘটনা নিয়ে আর কোন কথাই কেউ তুললো না। আসল ঘটনা জানতে পেরে মিথিলার বাপেরাসহ প্রতিবাদীরা সবাই খামুশ হয়ে গেল। মিথিলার স্বীকারোক্তি শুনে আজিজুল হকের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মুখটাও আর রইলো না মিথিলার বাপের।

খবরের কাগজ দেখে দেখে দিন কাটছে আজিজুল হকের। "অধ্যাপক চাই" বলে যে দুই একটা কলেজ থেকে বিজ্ঞাপন আসছে, সে কলেজগুলো তেমন উন্নত মানের না হওয়ায়, আজিজুল হক সে সবে আকৃষ্ট হচ্ছে না। অপেক্ষায় থাকছে সরকারি কলেজ, ভার্সিটি বা নিদেন্‌পক্ষে বেশ বড়োসড়ো বেসরকারি কলেজ থেকে বিজ্ঞাপন আসার। ব্যস্ততা নেই তাই। দাঁড়াবার স্থান যখন একটা পেয়েছে, তখন দেখেশুনে একবারে একটা ভাল জায়গায় যাবে সে। যেমন– তেমন কলেজে গিয়ে বারবার কলেজ বদল করতে আর ভাল লাগে না তার। বাড়িতে গিয়ে থাকলে, এইসব চাকরি-বাকরি খোঁজা-খুঁজিতে বিঘ্ন ঘটবে যথেষ্ট। তার চেয়ে এই স্থানকেই সে একাজে অধিক নিরাপদ বলে ভাবছে আর দিন কাটাচ্ছে এখানে বসেই।

দাড়িটুপি নিয়ে সমস্যা নেই আর কোন। হাই স্কুলের মৌলভি শিক্ষক সে। দাড়িটুপি তো থাকবেই। এখন সে মোটামুটি সবদিকেই নিরাপদ। মোটমুটি আরামেই দিন কাটতে লাগলো তার।

কিন্তু-ললাটের লিখন: আরাম তার হঠাৎ করেই হারাম হয়ে গেল আবার। সেদিন সে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে স্কুল থেকে এসে শুয়ে পড়লো বিছানায়। সেই যে শুয়ে

পড়লো, এরপর সাত-আটটা দিনরাত্রি কোনদিক দিয়ে গেল, সে কিছুই টের পেলো না। তিন চারদিন গেল তার জ্বরে সম্পূর্ণ অচেতন, অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থায়। বাদবাকি তিন চারদিন গেল অর্ধচৈতন্য অবস্থায়। জ্বরে এতটাই বেহুঁশ হয়ে গেল যে, এই সাত আটটাদিন একদম হারিয়ে গেল তার জীবনের হিসাব থেকে।

উপলক্ষ্য একদিন শুধু বৃষ্টিতে ভেজা। স্কুল থেকে ফেরার পথে ছাতা না থাকায় সে আচ্ছামতো ভিজেছিল দিন দুই আগে। এই সূত্র ধরেই শুরু হলো জ্বর, আর সে জ্বর উঠতে উঠতে বিপদসীমা অতিক্রম করে অনেক উপরে উঠে গেল। বিপদসীমার নিচে আর কিছুতেই নামে না। ক্ষণকালের জন্যে যদি বা এক আধ্ ডিগ্রি নামে তো পরক্ষণেই দুই তিন ডিগ্রি উঠে যায় একলাফেই। ডাক্তার সাহেব ওষুধের পর ওষুধ বদল করতে লাগলেন। মিস্ জেরিনা মাথায় দিবারাত পানি ঢালতে লাগলো আর পানিপট্টি দিতে লাগলো কপালে, জ্বর তবু কিছুতেই স্বাভাবিক পর্য্যায়ে আসে না।

গোটা সাতদিন কেটে গেল ঐভাবেই। আটদিনের দিন জ্বরটা একটু কমলো এবং এই দীর্ঘসময় সম্পূর্ণ অজ্ঞানে আর অর্ধজ্ঞানে থাকার পর আজিজুল হকের পুরোপুরি জ্ঞান ফিরলো আটদিনের দিন মধ্যরাতে। সে চোখ মেলে দেখলো, আলো জ্বলছে ঘরে। তার কোলের কাছে বসে কপালে পটি দিচ্ছে জেরিনা। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকার পর আজিজুল হক আটদিন অন্তর ক্ষীণ কণ্ঠে প্রথম কথা বললো– আমি কোথায়?

উৎকর্ণ হয়ে উঠলো জেরিনা। জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে সে খুশি হয়ে বললো– আপনি আপনার ঘরে।

আজিজুল হক টেনে টেনে ফের প্রশ্ন করলো– আমার ঘরে? আমার ঘর কোথায়?

ঃ কেন, আমাদের বাড়িতে। আমাদের এই বাগেরহাটের বাড়িতে। চিনতে পারছেন না আমাকে?

ঃ জি পারছি। কি হয়েছে আমার?

ঃ জ্বর হয়েছে। ভীষণ জ্বর।

ঃ ভীষণ জ্বর? তাই আমি শুয়ে আছি?

আজিজুল হক উঠতে গেল। জেরিনা বাধা দিয়ে বললো– খবরদার-খবরদার! খবরদার উঠবেন না। অজ্ঞান হয়ে যাবেন। সেরেফ লিকুইড্ খাদ্যের উপর আছেন। শক্ত কিছু পেটে এখনও পড়েনি। ভীষণ দুর্বল আপনি এখন।

জেরিনা তাকে ধরে শুইয়ে দিলো পুনরায়। শুয়ে পড়ে আজিজুল হক ফের প্রশ্ন করলো– এখন দিন, না রাত?

জেরিনা বললো– রাত। রাত প্রায় তিনটে।

ঃ তিনটে! সেই থেকে আপনি, মানে তুমি, বসে আছো এখানে? এত রাত পর্যন্ত?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ বলছি, সন্ধ্যা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত তুমি আমার ঘরে আছো?

জেরিনা বললো– শুধু আজ রাত তিনটে পর্যন্ত কেন? সাত আটটা রাত তো গোটাই আমি এখন আপনার ঘরে কাটাচ্ছি।

ঃ সাত-আটটা রাত? আমার ঘরে? কেন?

ঃ নইলে যে মারা যেতেন আপনি। সবসময় কপালে পানিপটি দেয়ার সাথে মাঝে মাঝেই মাথায় পানি না ঢাললে আর একঘণ্টা পরপর হিসেব করে ওষুধ না খাওয়ালে কি এতদিন বেঁচে থাকতেন আপনি?

ঃ কি তাজ্জব! সাত আটদিন ধরে তুমি এসবই করছো আর সারা রাত একাই থাকছো আমার ঘরে?

ঃ একাই বৈ কি? মাঝে মাঝে মেরিনা এসে আমার সাথে থাকে আর বাদ-বাকি রাতগুলো একাই থাকি আমি।

ঃ আমার এই বিছানায়?

ঃ আরে দুর! তা থাকবো কেন? ঐ যে ওপাশে আর একটা খাটপাতা হয়েছে তো!

ঃ ও–!

ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইলো আজিজুল হক। পরে আবার প্রশ্ন করলো– ভয় করলো না তোমার?

জেরিনা বললো– ভয়! কেন?

ঃ আমার ঘরে একা থাকছো, আমি যদি তোমার কোন বিপদ ঘটিয়ে ফেলি? ঐ মিথিলার মতো যদি জড়িয়ে ধরি তোমাকে?

দুঃখের মধ্যেও মিস্ জেরিনা মৃদু হেসে বললো– সে শক্তি কি আছে আপনার? আপনার তো উঠার শক্তিই নেই এখন।

ঃ ও, সেইজন্যেই ভয় পাওনি আমার ঘরে একা থাকতে? অসুস্থ বলে আমি কোন বিপদ ঘটাতে পারবো না তোমার, তাই?

ঃ সুস্থ-অসুস্থ যা-ই থাকুন, আমার কোন বিপদ ঘটাতে কোনদিনই আপনি পারবেন না, তাই।

ঃ কি করে বুঝলেন?

ঃ সেবার ঐ ক্লিনিকে সুস্থ অবস্থায় আমাকে এক বিছানায় পেয়েছিলেন, ঘুমের ঘোরে আমার একটা বাহুও আমি আপনার বুকের উপর রেখেছিলাম, কই, কিছু করতে পেরেছিলেন তবুও? ঘটিয়েছিলেন কোন বিপদ? আজ তো আপনি অসুস্থ?

আজিজুল হকও একটু হাসার চেষ্টা করলো। বললো– ও, মনেই রেখেছো সেই কথা?

ঃ মনে রাখবো না কেমন? এ কথা কি ভোলার? আপনাকে তো চিনে নিয়েছি আমি ঐ একদিনেই। সেই জন্যেই তো রাতের পর রাত ঐ ক্লিনিকে আর ঢাকার হাসপাতালে আপনার সাথে থেকেছি আমি নির্ভয়ে।

ঃ আচ্ছা। তা এখানে কেউ কিছু বলে না? এই যে তুমি আমার কাছে থাকছো, কোন বদনাম গায়না কেউ?

ঃ গায়না আবার। দু'একজন তো দুই এক কথা বলবেই। সেই ভয়ে কি আপনাকে একাঘরে ফেলে রেখে মেরে ফেলবো আমি? চোরের ভয়ে মাটিতে ভাত ঢেলে খাবো?

ঃ কেন, মিনুর মাকে থাকতে বলবে।

ঃ কি যে বলো, সরি, কি যে বলেন! তা হবে কি করে? নিজের কাজ কি অন্যের দ্বারা হয়?

ঃ এটা তোমার নিজের কাজ?

ঃ তাই বৈ কি? আমাদের বিপদ যদি আপনার বিপদ হয়, তাহলে আপনার বিপদ কি আমাদের তথা আমার বিপদ হতে পারে না?

ঃ আচ্ছা!

ঃ আর তা ছাড়া, আপনার জীবন সংশয় নিয়েই সবাই অস্থির। দু'একজন বদলোক ছাড়া ভাল মানুষেরা বদনাম গাইবে কি? সবাই তো আফসোস করেই বাঁচে না।

এই সময় ভীষণ জোরে কেশে উঠলো আজিজুল হক। অনেকক্ষণ কাশার পর কাশ থামলে সে ক্লান্ত কণ্ঠে বললো– পানি একটু পানি-

তাড়াতাড়ি পানির গ্লাস তার মুখে ধরলো জেরিনা। দুই তিন ঢোক পানি গিলে আজিজুল হক ধুকতে লাগলো শুয়ে শুয়ে। জেরিনা এবার শাসনের সুরে বললো– থাক। আর একটা কথাও নয়। অধিক কথা বলার জন্যেই এ অবস্থা হলো। ঘুমিয়ে পড়ুন এবার।

কোলবালিশটা পাশে দিয়ে আজিজুল হককে কাত করে শুইয়ে দিলো জেরিনা। এরপরে সে তার নিজের খাটে ফিরে এলো।

আরো দিন তিনেক পরে পুরোপুরি জ্বর ছাড়লো আজিজুল হকের। সে সুস্থ হয়ে উঠলো। চারদিনের দিন সকালের দিকে তাকে পেটপুরে খাইয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল জেরিনা। অনেকদিন পর পেটভরে খাওয়ার দরুন একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লো আজিজুল হক।

ঘুম ভাঙ্গলে আজিজুল হক দেখলো, জেরিনা ঘরে নেই। জেরিনার বোন মেরিনা ঐ দ্বিতীয় খাটটিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। তাকে দেখে বিস্মিত হলো আজিজুল হক। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো– একি তুমি এখানে যে?

জেরিনা হেসে বললো– আমি আপনাকে পাহারা দিয়ে আছি।

ঃ পাহারা দিয়ে আছো?

ঃ হ্যাঁ, তা তো থাকতেই হবে। এতবড় একটা ঝক্কি গেল, জ্বর ছাড়তে না ছাড়তেই কি আপনাকে একা ফেলে রাখা যায়। আপা আমাকে এই পাহারার কাজে বসিয়ে দিয়ে তবে বাড়ি থেকে বেরুলো।

আজিজুল হক বললো– বাড়ি থেকে বেরুলো কেমন? কোথায় গেল জেরিনা?

ঃ স্কুলে। কতদিন স্কুল কামাই হলো তার। চাকরিটা কি ঠিক রাখতে হবেনা?

ঃ স্কুল কামাই হলো কি করে? আমার জন্যেই বুঝি?

ঃ তবে আর কার জন্যে? হরিদাস পালের জন্যে?

মেরিনার মুখে হাসি। আজিজুল হক বললো– দিনেও জেরিনা তাহলে আমার কাছে থেকেছে?

ঃ দিনরাত সবসময়। নিজের নাওয়া-খাওয়ার হুঁশটাও তার ছিল না। স্কুলে যাবে কি?

আজিজুল হক স্বগতোক্তি করলো এতটাই সে করতে পারলো আমার জন্যে?

মেরিনা বেগম সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলো– এতটা মানে কতটা? কতটা আপনি জানেন?

ঃ জি? কতটা?

ঃ নিজের বিয়ে করা বউ যতটা করতে না পারে, আপনার জন্যে তার চেয়ে দশগুণের অধিক করেছে আপা, বুঝেছেন?

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে আজিজুল হক বললো- বলো কি!

ঃ যে ভবঘুরে মানুষ আপনি, চাল-চুলার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। যদি ভাল চান, এবার আপাকেই বিয়ে করে ফেলুন আপনি। আজিজুল হক চমকে উঠে বললো– মেরিনা!

মেরিনা বলেই চললো, বিপদে-আপদে তবেই আপনি বাঁচবেন। নইলে, যেখানে-সেখানে ঠ্যাং তুলে মরে পড়ে থাকবেন, দেখার কেউ থাকবে না। কাজেই, উপদেশটা আমার ভালোয় ভালোয় গ্রহণ করুন।

ঃ তোমার উপদেশ মানে?

ঃ ঐ যে বললাম, আমার আপাকেই বিয়ে করে ফেলুন! আমার আপাই হতে পারে আপনার একমাত্র রক্ষে কবজ।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আজিজুল হক নিঃশ্বাস ফেলে বললো– তা হতে পারে ঠিকই। কিন্তু আমি চাইলেই তো হবে না।

ঃ কি হবে না?

ঃ আমি তাকে শাদি করতে চাইলেই সে তাতে রাজি হবে কেন? বরং শোনামাত্র আমাকে তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে।

ঃ কেন, তাড়িয়ে দেবে কেন?

ঃ বাহ্! আমি মুসলমান। ইসলাম মেনে চলা লোক। তোমার আপা তার বিপরীত। সে ইসলাম বিদ্বেষীদলের লোক। ধর্মাধর্ম না-মানা প্রগতিবাদী মেয়ে। আমার মতো একজন দাড়িটুপিওয়ালা মুসলমানকে সে বিয়ে করতে রাজি হবে কেন?

ঃ কি যে বলেন! আপা তো আপনাকে বিয়ে করার জন্যে এক পায়ে খাড়া।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে আজিজুল হক প্রশ্ন করলো- কি বললে?

ঃ আপনাকেই তো বিয়ে করবে আপা। একমাত্র আপনাকেই।

ঃ মজাক করছো? উপহাস করছো সুযোগ পেয়ে?

ঃ কেন, উপহাস করবো কেন?

ঃ নইলে একমাত্র আমাকেই সে বিয়ে করবে, একথা বলছো কেন?

ঃ তবে কি গাজীর গীত শোনার জন্যে এতটা সে করলো? রাতদিন খেটে যে বাঁচিয়ে তুললো আপনাকে সেটা কিসের জন্যে সেরে উঠে আপনি তাকে গান গেয়ে শোনাবেন বলেই কি দিনরাত অনাহার-অনিদ্রায় কাটিয়ে সে সেবা করলো আপনার?

www.boighar.com

ঃ মেরিনা! এ তুমি কি বলছো? সত্যিই কি তুমি উপহাস করছো না?

ঃ এক রত্তিও না। আপনাকে বিয়ে করার জন্যে আপাতো মনস্থির করে আছে সেই অনেকদিন আগে থেকেই। বাবার চিকিৎসার সময় আপনারা যে এক সাথে ছিলেন, তখন থেকেই। বিস্ময় বেড়েই চললো আজিজুল হকের। প্রশ্ন করলো– সেকি! তুমি সেটা কি করে জানলে?

ঃ আপাই আমাকে বলেছেন।

ঃ তোমার আপাই তোমাকে বলেছেন? অকারণেই সে তোমাকে বলতে গেল এই কথা?

ঃ অকারণেই হবে কেন? ঢাকা থেকে আপনাকে সাথে করে নিয়ে আপারা যখন প্রথম বাড়িতে এলেন, তখন আর পাঁচজনের মতো আমিও তাকে বলেছিলাম, "একজন মৌলবাদীকে সরাসরি বাড়িতে নিয়ে এলে কেন? উপকার করেছে, কিছু টাক-পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিলেই পারতে তোমরা?" এতে আমার আপা কি বললো– জানেন? বললো– "বিদায় করে দেয়ার লোক হলে তো, তাই দিতাম। কিন্তু এ লোক তো বিদায় করে দেয়ার লোক নয়।"

ঃ আচ্ছা!

ঃ আপা বললো– "এঁকে বাড়িতে এনেছি বাড়িতেই রাখবো বলে।" বললাম, বাড়িতে রাখবে কি রকম? কিভাবে রাখবে একে বাড়িতে? একথায় আপা শক্ত কণ্ঠে বললো– "তোর ভগ্নিপতি করে।" আমি চমকে উঠে বললাম, "ভগ্নিপতি করে! সেকি আপা! একেই বিয়ে করবে তুমি?" আপা বললো, "করবোনাতো কি

আজীবন আইবুড়ো হয়ে থাকবো?" আমি বললাম, "একে ছাড়া আর বর পেলেনা তুমি?" আপা বললো, "না। এ জীবনে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বর আর একটাও পেলাম না। আর এর চেয়েই বা বলি কেন, এর এক চতুর্থাংশ উত্তম মানুষও আমি আজ পর্যন্ত পাইনি কোথাও। এমন অমূল্য রতন হাতে পেয়ে কি পায়ে ঠেলবো আমি?"

ঃ তারপর?

ঃ আপা বললো– "মৌলবাদী রাজাকার যা-ই তোরা বলিসনে কেন, এমন মানুষকে বিয়ে করার ভাগ্য হবে যে মেয়ের, জীবন তার ধন্য হয়ে যাবে। এর মতো এত সৎ আর মহৎ মানুষ আমাদের এই ধর্মহীন, মদখোর আর লম্পট প্রগতিবাদীদের মধ্যে লাখে একটাও খুঁজে পাবিনে।"

শুনে আজিজুল হক তাজ্জব হয়ে বললো– বলো কি? এতটাই তোমার আপা তোমার কাছে বললো?

মেরিনা বললো– এতটাই এতটাই। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?

ঃ বিশ্বাস হলেও বলবো, এটা তার কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়। আবেগের বশে আর ঝোঁকের মাথায় হয়তো এসব কথা বলেছে তখন। আবেগের কোন কথাই কারো কায়েমী কথা হয় না। আবেগটা ফিঁকে হয়ে গেলেই সবকিছু যায় মিলিয়ে।

এ কথায় মেরিনা চোখ পাকিয়ে বললো– আরে এই-এই, এই মিয়া সাহেব, আপা আপনাকে এতটা চিনে ফেললো আর এক সাথে থেকে আপনি আপাকে কিছুই চিনতে পারলেন না? আবেগের বশে বা ঝোঁকের মাথায় কোন গুরুতর কথা কখানোই বলে না আপা। সব কথাই তার কায়েমী কথা আর যা বলে তা সে কার্যকর করেই ছাড়ে।

ঃ মেরিনা!

ঃ বড়ই জিদি মেয়ে সে। যদি কোন জিদ্ ধরে বসে একবার, তাহলে তাকে সেই জিদ্ থেকে সরায় এমন সাধ্য কারো নেই। আমরা এটাই দেখে আসছি আজীবন।

আজিজুল হক চিন্তিত কণ্ঠে বললো– কিন্তু তোমার কথার তো আমি কোন মাথামুণ্ডু পাচ্ছিনে। আমি নামাযি মানুষ। সে চাইলেও, বেনামাযি মেয়েকে আমিই বা শাদি করতে চাইবো কেন?

সঙ্গে সঙ্গে মেরিনা সোচ্চার কণ্ঠে বললো– আরে না-না, বেনামাযি তখন তো থাকবে না আপা। কিছু কিছু নামায সেও পড়বে। এ কথাও আমাদের মধ্যে হয়েছে।

আজিজুল হক বললো– কিন্তু কিছু হলে তো চলবে না। মুসলমানকে শাদি করলে তাকেও পুরোপুরি মুসলমান হতে হবে।

ঃ আরে বাবা, দুইজন দুইজগৎ থেকে এসে একাত্ম হচ্ছেন। কিছু কিছু ছাড় তো দিতেই হবে দু'জনকে।

ঃ না, ইসলামে কোন ছাড় নেই।

ঃ ছাড় না থাক, সহ্য তো আছে। প্রথম প্রথম কিছুটা সহ্য করে নিয়ে পারলে আস্তে আস্তে নিজের মতো করে গড়ে নেবেন তাকে। এক লাফে গাছের মাথায় উঠতে চাইলে তা হবে কেন?

এই সময় ফিরে এলো জেরিনা। ঘরে ঢুকেই মেরিনাকে বললো– সেকিরে। এত কিসের গল্প হচ্ছে?

মেরিনা বললো– একি আপা। এত সকাল সকাল ছুটি হলো তোমার স্কুলের।

জেরিনা বললো– না, ছুটি হয়নি। পয়লা দিন তো, তাই আমি হাজিরা দিয়েই চলে এলাম। তা কি এত বক বক করছিলি তোরা দু'জন?

মেরিনা ঝোঁকের মাথায় ফস্ করে বলে ফেললো বক বক নয় আপা। তুমি যে একে বিয়ে করতে চাও, একে ছাড়া যে আর কাউকেই তুমি বিয়ে করবে না, সে কথা ইনি বিশ্বাস করতেই চাচ্ছেন না।

শুনে শরমে সংকুচিত হয়ে গেল আজিজুল হক ও জেরিনা দু'জনই। জেরিনা ধমক দিয়ে বললো– ধ্যাঁৎ! এসব কি পাকামি! যত্ত সব–

বলেই তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জেরিনা। এর কিছুদিন পরের কথা। আজিজুল হক এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। স্কুল করতে শুরু করেছে আবার। এই অবস্থায় একদিন স্কুল থেকে এসে চা-নাশতা খেতে বসে আজিজুল হক জেরিনাকে বললো– একটা সমস্যা হলো হঠাৎ? দুই একদিনের মধ্যেই আমাকে আমার বাড়িতে যেতে হবে।

সচকিত হয়ে উঠে জেরিনা বললো– বাড়িতে? সেকি! কেন-কেন?

ঃ আমার মাদ্রাসা পাশের সার্টিফিকেটগুলো সব বাড়িতে আছে। সার্টিফিকেট জমা না দিয়েই চাকরি করছি আমি। এখন সেই সার্টিফিকেট জমা দেয়ার জোর তাকিদ উঠেছে।

ঃ কেন? তোমার, মানে আপনার-

আজিজুল হক হেসে বললো, থাক-থাক, জো আপ্‌ছে আপ্ আতা হ্যায়, উস্‌কো আনে দো। যে কথা মুখে মাঝে মাঝেই এসে যাচ্ছে। আপ্‌ছে আপ্, জোর করে তাকে আর বার বার ঘুরিয়ে দেয়া কেন?

ঃ কোন কথা?

ঃ ঐ তুমি'টা। 'তুমি' ছেড়ে আর 'আপনি' কেন? আমি 'আপনি' ছেড়েছি, এবার তুমিও ছাড়ো।

ঃ ছিঃ। তাই কি হয়, লোকে বলবে কি?

ঃ তবুও লোকের ভয়? পর পুরুষের ঘরে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতে যার লোকের ভয় হলো না, সেরেফ 'তুমি' বলতেই তার এত লোকের ভয়? ওসব বাহ-ানা ছাড়ো। এতই যখন আমার কাছে আসতে পেরেছো, কোন জড়তা রাখোনি,

কথাবার্তাতেও জড়তা ছেড়ে সহজ হও এবার। একজন 'তুমি' একজন 'আপনি' ভাল লাগে না এটা।

ঃ তাই?

ঃ জি, তাই। এর অন্যথা আর বরদাস্ত করা হবে না।

ঃ ওরে বাবা! এযে একদম হুকুম। ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। হাজার হোক, ইস্কুলের হেড মাওলানা তো! তার হুকুম তো মানতেই হবে। এবার বলো দেখি, হঠাৎ তোমার সার্টিফিকেট চাইছে কেন স্কুল? তোমার বিদ্যা নিয়ে ওদের মনে কি কোন সংশয় দেখা দিয়েছে?

ঃ আরে না-না, কিছুমাত্র না। সে প্রশ্নই উঠে না। ওটা সেরেফ ফর্ম্যালিটি। ফাইলে রাখতে হবে ওটা। শিগগিরই স্কুল ইনসপেকটার ইনসপেকশনে আসছেন কিনা, ফাইলে সার্টিফিকেট না দেখলে ঝামেলা পাকাতে পারেন, তাই।

ঃ ও আচ্ছা। তা কবে তক্ যাবে?

ঃ তুমি অনুমতি দিলে দু'একদিনের মধ্যেই।

ঃ আমার অনুমতি তোমার দরকার?

ঃ দরকারই তো। যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছো তুমি, আর দরকার না হয়ে পারে?

ঃ যে সিদ্ধান্ত কি রকম?

ঃ সেদিন মেরিনা যে কথা বললো, সেই কথা। আমাকে ছাড়া নাকি আর কাউকেই বিয়ে করবে না তুমি?

ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে ফের "ধ্যাৎ" বলে নীরব হলো জেরিনা। মাথা নিচু করে রইলো। তাকে নীরব দেখে আজিজুল হক ফের প্রশ্ন করলো কি হলো, নীরব রইলে যে? জেরিনার কথা কি সত্যি?

আস্তে আস্তে মাথা তুলে জেরিনা নিম্ন অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, সত্যি।

ঃ একদম সত্যি? মানে ঐ সিদ্ধান্তই স্থির সিদ্ধান্ত তোমার?

ঃ আমার সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হয় না।

ঃ সেকি! এটা তো তোমার একার বিষয় নয়। দুই পক্ষের বিষয়। আমি যদি রাজি না হই তাতে?

ঃ সেটা তোমার ব্যাপার। তুমি রাজি না হও, না হবে। আমি করবোই না বিয়ে কখনো। বিয়ে না করলে কি হবে? বিয়ে না করে কি মানুষ কখনো বাঁচে না? এখন যেভাবে কাটছে বাকি জীবনটাও এইভাবেই কেটে যাবে। ক্ষতি কি?

ঃ তাজ্জব! তা একমাত্র আমাকে শাদি করবে, এমন সিদ্ধান্ত নিলে কেন?

ঃ আমার মনে ধরার মতো এ যাবৎ আর কাউকে পাইনি বলে।

ঃ আজ না পাও, ভবিষ্যতে তো অন্য কাউকে মনে ধরতেও পারে তোমার?

ঃ মনে ধরার ব্যবসা খুলে বসিনি আমি যে, ক্ষণে ক্ষণেই বদল করবো সিদ্ধান্ত। তোমার ইচ্ছে না থাকে, না থাকুক। তাতে কি এসে যায়? নাইবা হলো বিয়ে আমার। জোর করে তোমাকে বিয়ে করতে না গেলেই তো হলো?

ঃ কি আশ্চর্য! একেই বলে গোবরে পদ্মফুল।

ঃ কি বললে?

ঃ এমন নাস্তিক আর ধর্মহীন পরিবেশে এতটা ঈমানের জোর কোথায় পেলে তুমি?

ঃ ভণিতা করছো?

ঃ ভণিতা নয়। তাহলে এই ঢাক ঢাক গুড় গুড় অবস্থা আর চলতে দিতে পারিনে আমি। হয় তোমকে শাদি করতে হবে, নয় এখান থেকে পালাতে হবে আমাকে। বাইরের ঐ ক্রমবর্ধমান গুঞ্জরণ আর সহ্য করা সম্ভব নয়।

ঃ তাহলে কি করতে চাও? পালাবে?

ঃ না, তোমাকে শাদি করতে চাই আর তা অল্প দিনেই। তুমি কি তাতে রাজি?

ঃ অল্পদিনেই?

ঃ হ্যাঁ অল্প দিনেই। তোমার মতো আমারও তোমাকে পছন্দ। এমন তেজস্বী আর খোলা মনের স্পষ্টবাদী মেয়েই আমি চাই। বিলম্বে বিপত্তি ঘটে বিস্তর। বিলম্ব করে তোমার মতো মেয়েকে আমি হারিয়ে ফেলতে চাইল।

জেরিনা এবার আপ্লুত কণ্ঠে আওয়াজ দিলো হক। আজিজুল হক বললো– যদি রাজি থাকো, তাহলে অনুমতি দাও, সার্টিফিকেট আনতে বাড়িতে যাচ্ছি। আমার আব্বা-আম্মার অনুমতিটাও নিয়ে আসি সেই সাথে।

জেরিনা এবার বিপুল আগ্রহে বললো– ওঃ! কি চমৎকার! তাই করো আজিজুল হক, তাই করো। সত্যিই বাইরের বদনাম বেড়ে যাচ্ছে ক্রমেই। আমাদের ঐ ভুয়া সভ্য পরিমণ্ডলের দাপাদাপিও বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনদিন। এসবকে আর বাড়তে না দিয়ে, এগুলোকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করো শিগগির।

ঃ তাহলে আমার আব্বা-আম্মার অনুমতিটা আনবো তো? পরে আবার মত পাল্টাবে না তো? বলবে না তো, আর কিছুদিন যাক?

ঃ কখনোই না। এখনই শাদিটা আমাদের হয়ে যাক, এজন্যে আমি এক পায়ে খাড়া।

বাড়িতে এসে আজিজুল হক উল্টা চাপে পড়ে গেল। অনেকদিন পরে ছেলেকে বাড়িতে ফিরতে দেখে আজিজুল হকের আব্বা আজিজুল হকের আম্মাকে বললেন– তোমার প্রশ্রয়েই ছেলে এত বেয়াড়া হয়ে গেছে। বাড়িঘর ছেড়ে বাপ-মায়ের আশা আকাঙ্ক্ষা দুই পায়ে মাড়িয়ে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দেশ। এবার তাকে বলো, এতোদিন পরে দয়া করে ফিরলোই যখন বাড়িতে আর উড়ু উড়ু না করে সংসারে এবার বসুক। ঘরসংসারে মন দিক এবার।

আজিজুল হকের আম্মা বললেন– সংসারে বসবে কি করে? বয়স তো বসে নেই। বাড়তে বাড়তে আসমানে ঠেকে গেল। বাড়িতে বউ-বাচ্চা না থাকলে জোয়ান ছেলের মন বসে বাড়িতে?

আব্বা বললেন– আরে সেই কথাই তো বলছি। সেই ব্যবস্থাই করবো এবার। কতদিন ধরে তাঁক করে বসে আছি, কিন্তু শয়তানটা সেই যে গেল আর বাড়িতে ফেরার নাম নেই। এসেছে যখন শেষ পর্যন্ত, এবার আর ছেড়ে কথা নেই।

ঃ কি করতে চাইছেন আপনি?

ঃ শাদি দেবো ছেলের। শেকল পরাবো পায়ে। দেখি, বাড়ি ছেড়ে এবার বাইরে যায় কেমন করে।

ঃ শাদি দেবেন? কোথায়?

ঃ আমার দোস্ত খন্দকার আলী উসমানের মেয়ের সাথে। খানদানি পরিবার, খাশা মেয়ে। যেমনই আদব-কায়দা তেমনই পর্দানশিন আর পরহেজগার।

ঃ তা কথাবার্তা কি বলেছেন কিছু আপনার ঐ দোস্তের সাথে? এই শাদির ব্যাপারে?

ঃ বলেছি মানে কি? কথাবার্তা একদম পাকাপাকি করে নিয়ে ঐ বাউণ্ডুলেটার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় বসে আছি। সে দিকে কি বাকি আছে কিছু?

ঃ বলেন কি! কবে এসব করলেন?

ঃ কবে কি বলছো? দুই বছর আগে আমি কথা দিয়ে রেখেছি আলী উস্‌মান সাহেবকে। সেই থেকেই চলছে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা। আমার কথার ওপর নির্ভর করে কত উমদা উমদা শাদির পয়গাম ফিরিয়ে দিয়েছেন উনি। অনেক তোফা তোফা শাদির প্রস্তাব নাকোচ করে দিয়ে উনি কেবল আমারই মুখ চেয়ে বসে আছেন। তাকিদ দিচ্ছেন বার বার। এবার যখন বাড়িতে ফিরে এসেছে ছেলে, আর কথা নয়। এই সপ্তাহের মধ্যেই শুভ কাম ইনশাআল্লাহ সম্পন্ন করে ফেলবো। সেই মোতাবেক ছেলেকে তুমি তৈয়ার থাকতে বলে দাও।

ঃ সে কি! একদম পাকা করে ফেলেছেন সব। সবকিছু চূড়ান্ত করে ফেলেছেন?

ঃ চূড়ান্ত-চূড়ান্ত। ফাঁক নেই আর কিছু।

আজিজুল হকের আম্মা এবার বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন– এটা কি ঠিক হলো? ছেলের কোন মতামত না নিয়ে এক তরফাভাবে সব ফায়সালা করে রাখলেন, এটা কি ভালকাজ হলো? ফল কি ভাল হবে এর?

ঃ কেন হবে না?

ঃ ছেলে তো অন্য কাউকে পছন্দ করে থাকতে পারে। অন্য কাউকে শাদি করার জন্যে মনস্থির করে থাকতে পারে?

ঃ থাকলেও সেটা না-মঞ্জুর। সেসব চিন্তা-ভাবনা তাকে ত্যাগ করতে হবে। বাপের ইচ্ছাকেই মেনে নিতে হবে এবার আর বাপের পছন্দকেই কবুল করতে হবে। বার বার বাপের অবাধ্য হলে, তাকে আমি ছেড়ে দেবে না এবার।

ঃ কিন্তু–

গর্জে উঠলেন আজিজুল হকের বাপ। বললেন– খবরদার! এই রকম লাই দিয়ে আর প্যাঁচ পাকিয়ে পাকিয়ে তুমিই ওকে পিতার অবাধ্য করে তুলেছো। আমি চাইলাম চাকরির তালে না থেকে ব্যবসাপাতিতে মন দিক আর ঘর সংসার দেখাশুনা করুক। কিন্তু তোমার প্রশ্রয়েই সে বাপের সেই আদেশ আর ইচ্ছার কোন মর্যাদাই দেয়নি। নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে বাপের ইচ্ছাকে দুই পায়ে মাড়িয়েছে। এবার আর কোন অজুহাত আমি শুনবো না। এবারও আমার অবাধ্য হলে আর ওয়াদা খেলাপ করার দায়ে মানুষের কাছে আমাকে অপদস্থ হতে হলে, ওর সামনে আমার বাড়ির ফটক চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এই সংসারের এক কণাও তাকে আমি দেবো না। আমার সাফ কথা।

ঃ সেকি! এসব কি বলছেন?

পুনরায় গর্জে উঠলেন আজিজুল হকের আব্বা। বললেন, চোপ্! ফের সেকি? এবার তোমাকেও বলে রাখছি, যেভাবে পারো, ছেলেকে রাজি করাও। নইলে তোমার নসিবেও চরম দুঃখ আছে, বলে দিলাম। হয়তো ঐ অবাধ্য ছেলের সাথে তোমাকেও যেতে হবে এই বাড়ি ছেড়ে। চরম আল্টিমেটাম দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাপ। তিনি ছুটলেন ঐ পাকিয়ে রাখা শাদিটাকে আরো অধিক পাকাপাকি করতে।

আম্মা এবার ছেলেকে ডেকে এসব কথা বললেন– বললেন– তার বাপের দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা। অন্যথা করার করুণ পরিণতির আভাসটাও সেই সাথে দিলেন।

শুনে ছেলে কিছুক্ষণ দমধরে বসে রইলো। পাল্টে গেল তার চোখ-মুখের চেহারা। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পর ছেলে মজবুত কণ্ঠে বললো- আব্বার এই সিদ্ধান্ত আমার মেনে নেয়া সম্ভব নয়- কিছুতেই নয়।

চমকে উঠলেন আম্মা। বললেন- সম্ভব নয়? সেকি। একি বলছিস্ তুই? এতে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে ।

ঃ যা হয় হোক। তবু ঐ শাদি করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

ঃ অসম্ভব? অসম্ভব কেন?

ঃ ও মেয়ের খবর জানি আমি। আব্বার এই রকম চিন্তাভাবনার কথা শুনে অনেক আগেই আমি খোঁজ নিয়েছি ঐ মেয়ের। একেবারেই এক অশিক্ষিতা মেয়ে ওটা। কবর্গ বঞ্চিত মূর্খ মেয়ে। চেহারাও আদৌ কিছু আকর্ষণীয় নয়। এ রকম মেয়ের সাথে জীবন কাটানো সম্ভব নয় আমার।

আম্মা একথায় আকুল কণ্ঠে বললেন- আজিজুল, আজিজুল হক। এমন কথা বলছিস কেন, লেখাপড়া না- জানুক, মেয়েটা, পরহেজগার মেয়ে। বংশটাও খানদানি।

বংশ নিয়ে আমি কি করবো আম্মা? বংশটা কি ধুয়ে খাবো আমি, না আমি শাদি করবো ঐ বংশটাকে। আর পরহেজগারের কথা বলছেন? আমার যে বউ হবে পরহেজগার তাকে হতেই হবে। সবগুলো নামায আদায় করাসহ সবগুলো

রোযা তাকে রাখতেই হবে। হতেই হবে তাকে পর্দানশিন আব্রু করা মেয়ে। এসবই সবকথা নয়। এর সাথে শিক্ষিতাও হতে হবে সে মেয়েকে। কোন অশিক্ষিত বউ নিয়ে ঘর করতে আমি পারবো না আর পারবো না কি? এটা আমি কল্পনা করতেও পারিনে।

আম্মা অনুরোধ করে বললেন– অবুঝ হোস্নে আব্বা! বার বার বাপের অবাধ্য হোস্নে। মেয়েটা অশিক্ষিতি হয়েছে তো কি হয়েছে? শাদি করে আনার পর তুই নিজে তাকে শিক্ষিতা করে তুলিস। তুইতো পণ্ডিত মানুষ। কয়েকবছর না হয় ঘরেই তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে নিস।

আজিজুল হক চরম বিরক্তির সাথে বললো– কি বাজে কথা বলছেন আম্মা? সে বয়স কি আছে কারো? আছে কি আপনার ছেলের না আছে ঐ মেয়ের সেই বয়স? মাথার চুলে পাক ধরা-ধরা অবস্থা সবার। এই বয়সে ঘরে পাঠশালা খুলে লেখাপড়া শেখাতে বসবো বউকে আর লেখাপড়া শিখিয়ে তাকে মানুষ করে তুলবো। বাহাদুরি দেই আপনার চিন্তা-ভাবনাকে আম্মাজান!

আম্মাজান অসহায় কণ্ঠে বললেন– হায়-হায়! তাহলে কি করতে চাস্ তুই?

ঃ সরাসরি না করে দেবো এ শাদি। আব্বার এ খাহেশ জান গেলেও পূরণ করা সম্ভব নয় আমার।

ঃ ওরে বাপরে! এ কথা শুনলে তোর আব্বার মাথায় খুন চেপে যাবে। হিংস্র হয়ে উঠবেন তিনি।

ঃ উঠেন উঠুন। না হয় খুন করবেন আমাকে। তবু আব্বার পাকিয়ে তোলা ঐ শাদি কিছুতেই আমি কবুল করতে পারবো না। কখ্খনো না।

ঃ তোকে উনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন। বিষয়-সম্পত্তির সবকিছু থেকে বঞ্চিত করবেন তোকে। সবটাই তোর ঐ দুই ভাইয়ের নামে লিখে দেবেন। তোকে এর এক কণাও দেবেন না।

ঃ না দেন, না দেবেন। আমার নসীবে আল্লাহ তাআলা যা রেখেছেন, তাই হবে।

ঃ আজিজ! বাপজান!

ঃ জীবন দিয়েছেন যিনি আহারও তিনিও দেবেন আম্মাজান। আব্বাজানের এই অনর্থক আর অযৌক্তিক জিদ্ কিছুতেই পূরণ করতে পারবো না আমি। কিছুতেই না।

সাফকথা জানিয়ে দিলো পুত্র। স্ত্রীর মুখে পুত্রের কথা শুনে, পিতাও জানিয়ে দিলেন সাফ কথা। উত্তেজনার কিছু মাত্র বহির্প্রকাশ না ঘটিয়ে পুত্রের কথা শুনে পাথর হয়ে গেলেন তিনি। স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– তুমি এখন বলো, এক কথায় আর এখনই তোমার ছেলেকে তুমি বাড়ি থেকে বের করে দেবে, না চাকর-বাকর ডেকে ওকে পিটতে পিটতে সীমানা ছাড়া করবো আমি, বলো? এই দুটির একটি বেছে নাও। এখনই।

স্ত্রী অনুনয় করে বললেন– দোহাই আপনার। অবুঝ হবেন না। ছেলেকে আর একটা সুযোগ দিন।

ঃ সুযোগ দেবো? বিয়ে না করে সে ষাঁড়ের মতো সারাদেশ চষে বেড়াবে আর সেই কুপুত্রকে আমি আর একটা সুযোগ দেবো? বয়স পেকে তাল গাছ হলো তার।

এ বয়সেও শাদি করতে যে নারাজ, সে একজন নষ্ট চারিত্রের নাদান ইনসান। তাকে পুত্ররূপে আমার সংসারে লালন করা জিন্দেগীতেও সম্ভব নয় আমার।

ঃ না-না, শাদি সে করবেনা, একথাতো বলছে না। ঐ মেয়েকে শাদি করতে সে নারাজ।

ঃ নারাজ! ঐ রকম একটা পর্দানশিন নামাযি মেয়েকে শাদি করতে সে নারাজ? তাহলে সে শাদি করতে চায় কাকে? লারে-লাপ্পা মার্কা কোন বোষ্টুমী বা খেস্টানী মেয়েকে?

ঃ না, তা করবে কেন? পর্দানশিন আর নামাযি মেয়েকেই শাদি করতে সে চায়। শুধু তার দাবি, সেই সাথে মেয়েটা কিছুটা শিক্ষিতা হওয়া চাই।

ঃ মিথ্যা-মিথ্যা। সবই ওর ভাঁওতা। খোঁজ নিয়ে দেখোগে, নিশ্চয়ই কোন ডাইনি যুগিনী বা হাড়ি ডোম-মেথরানীর পাল্লায় পড়েছে সে। পর্দানশিন মেয়েকে যে সে শাদি করবে না কিছুতেই এটা বুঝতে আর একবিন্দুও বাকি নেই আমার।

ঃ না-না, এটা আপনার ভুল ধারণা। তেমন ছেলেই নয় আমার আজিজুল হক।

মুখ বিকৃত করে আজিজুল হকের আব্বা বললেন– ইঃ! তেমন ছেলেই নয় আজিজুল হক! বললেন– হলো? ঘরের মধ্যে বসে থেকে শুধু খোয়াব দেখলেই ছেলের চরিত্র পবিত্র হয়ে যায় না। বাইরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখো গে, চরিত্র তার কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঃ কিন্তু–

ঃ খবরদার! কথা আর বাড়িও না। হয় তুমি তাকে এক্ষুণি বের করো বাড়ি থেকে, নয় এক্ষুণি আমাকে চাকর বাকর ডাকতে দাও। ওকে বের করে দিয়ে ওর সামনে এ বাড়ির ফটক চিরতরে বন্ধ করে দেই। কোনটা চাও, জলদি বলো–

ঃ আচ্ছা, আমিই তাকে বের করে দিচ্ছি। কিন্তু দোহাই আপনার। আমাকে একটা কথা দিন। ও যদি কোন পর্দানশিন মেয়েকে শাদি করে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে, তখন তো ফটকের দুয়ার খুলে দেবেন আবার? সেটা তো বন্ধ করেই রাখবেন না?

স্ত্রীর এ কথার জবাবে স্বামী মোকতাছার বললেন– সেটা বিবেচনা সাপেক্ষ। যদি সে মেয়ে সত্যিই পর্দানশিন আর নামাযি মেয়ে হয়, তখন সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে। কিন্তু সে কথা এখন নয়।

ঃ অন্তত কথাটা এখন দিন।

ঃ না, কখ্খনোই নয়। কথাটাও তখন, অর্থাৎ ঐ বিবেচনা সাপেক্ষে। আমি এক কথার মানুষ। আমাকে উত্যক্ত করো না। ওকে বের করে দাও এক্ষুণি–

হুকুম দিয়েই সরে গেলেন আজিজুল হকের আব্বা। আজিজুল হকের আম্মা আজিজুল হককে ডেকে সব কথা জানালেন আর চোখের পানি ফেলতে লাগলেন।

শুনে আজিজুল হক স্থিরকণ্ঠে বললো– ফটক যদি আমার সামনে বন্ধ হয়েই যায়, আমি সে ফটক খুলে দিতে কখনোই বলবো না আম্মা। সেজন্যে দুঃখও করবো না কিছুই। শুধুই একটি প্রার্থনা, আপনারা, বিশেষ করে আপনি দোআ রাখবেন আমার ওপর। আর কিছু চাইনে আমি।

আম্মাজান ডুকরে উঠে বললেন– তাহলে কি আর কখনোই তুই আসবিনে ফিরে বাড়িতে? দেখবিনে আমার মুখ?

ঃ আব্বার মতো আমি তো কোন প্রতিজ্ঞা করিনি আম্মা যে, আসবো না? আর একটি বার আসবো। একবার এসে দেখে যাবো ফটকটা আমার জন্যে খোলা আছে, না সত্যি সত্যিই চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

আম্মাজান ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– খোলা থাকবে, জরুর খোলা থাকবে। তুই যদি কোন পর্দানশিন মেয়েকে শাদি করে নিয়ে সত্বর বাড়ি ফিরে আসিস্, তাহলে এ ফটক কোনদিনই বন্ধ হবেনা তোর সামনে। এ সংসারের এক কণাও হারাতে হবে না তোকে।

উৎসাহিত হয়ে উঠে আজিজুল হক বললো– সত্যি বলছেন– আম্মা? আব্বা তাহলে মেনে নেবেন আমাকে? মানে, আমাকে আর আমার বউকে?

ঃ নেবেন বাপজান, নেবেন। তিনি তোমার শাদি দেখতে চান। বাড়িতে বউ আসুক এটা তিনি চান। যদি কোন পর্দানশিন নামাযি মেয়েকে সত্বর শাদি করে আনিস তাহলে দেখবি, তোর আব্বার তামাম ক্রোধ একদম পানি হয়ে গেছে। ক্রোধের লেশমাত্রও আর তার মধ্যে নেই। কিন্তু বউটা অবশ্যই পর্দাআব্রু করা নামাযি মেয়ে হওয়া চাই।

ঃ আপনি তাহলে এযাযত দিচ্ছেন আম্মাজান? অনুমতি দিচ্ছেন আপনি?

ঃ হ্যাঁ দিচ্ছি। সেই সাথে এ ঘোষণাও দিচ্ছি যে, পর্দানশিন বউ সঙ্গে না নিয়ে আবার যদি একা একা তুই বাড়িতে ফিরে আসিস, তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি তুই।

আজিজুল হক আর্তনাদ করে উঠলো– আম্মা!

ঃ মরামুখ-মরামুখ। আমার মরা মুখ দেখবি তুই-এর কোন অন্যথা হবে না।

কাঁদতে কাঁদতে দ্রুতপদে সেখান থেকে সরে গেলেন আজিজুল হকের আম্মা। আজিজুল হক সেখানে মুহূর্ত খানিক দাঁড়িয়ে রইলো প্রস্তর মূর্তির মতো।

www.boighar.com

মাদ্রাসা পাসের সার্টিফিকেটটাসহ আনন্দ বিষাদ মিশ্রিত এক অনুভূতি নিয়ে আজিজুল হক ফের ফিরে এলো জেরিনাদের বাগেরহাটের বাড়িতে। আজিজুল হককে ফিরতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল জেরিনা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে প্রশ্ন করলো অনুমতি পেয়েছো? আমাদের বিয়েতে তোমার বাপ মায়ের অনুমতি?

জবাবে আজিজুল হক বললো– হ্যাঁ পেয়েছি। তবে আব্বার নয়, আমার আম্মার অনুমতি।

দপ্ করে নিভে গেল জেরিনার মুখের আনন্দ আভা। উৎকণ্ঠিত হয়ে সে প্রশ্ন করলো– কেন, তোমার আব্বা কি এ বিয়েতে রাজি নন?

ঃ গররাজি তিনি নন, আবার রাজিও নন। তিনি যা চান, তা পূরণ হলে আর নারাজ তিনি থাকবেন না। আমাদের শাদি তিনি মেনে নেবেন খোশদীলেই।

ঃ বলো কি? তাহলে কি চান তোমার বাবা?

ঃ পর্দানশিন নামাযি মেয়ে।

ঃ অর্থাৎ? আমি কি ধরনের মেয়ে তা তিনি জানলেন কি করে? তুমি কি বলেছো কিছু?

ঃ না, কিছু বলিনি। তবে একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

ঃ কি ঘটনা?

ঃ বাড়িতে গিয়েই আমি একটা মস্তবড় মুসিবতে পড়ে যাই। আমার আব্বা আমাকে তখনই এক খানদানি মুসলিম পরিবারের এক পর্দানশিন নামাযি মেয়ের সাথে শাদি দিতে উদ্যত হন। শাদিটা তিনি আগে থেকেই পাকাপাকি করে রেখেছিলেন। আমি বাড়িতে পৌছার সাথে সাথে শাদি দেয়ার উদ্যোগ নিলেন তিনি।

ঃ সেকি! এত তাড়াতাড়ি?

ঃ হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই। কারণ, আমি তো বাড়িতে থাকিনে। অনেকদিন পরে বাড়ি গিয়েছি আমি। আবার যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যাই, এই ভয়েই তাড়াতাড়ি উদ্যোগ নিলেন তিনি। অন্যকথায় আমার পায়ে বেড়ি পরাতে চাইলেন তিনি।

ঃ তারপর?

ঃ আমি রাজি না হওয়ায়, আমার আব্বা যারপর নেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখনই।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আমাকে তার সমুদয় বিষয়বিত্ত থেকে বঞ্চিত করারও সিদ্ধান্ত নিলেন সেই সাথে।

ঃ বলো কি! তারপর?

ঃ আমার আম্মা মধ্যস্থতা করায় আব্বা তৎক্ষণাৎ তা করলেন না। সাময়িকভাবে সেসব স্থগিত রেখে দিলেন আরকি।

জেরিনার চোখ মুখ ঘেমে উঠলো। প্রশ্ন করলো– আপনার আম্মা মধ্যস্থতা করে কি বললেন?

ঃ কি বললেন, সে সব কথা আমি শুনিনি। কথা হয়েছে সেরেফ তাঁদের দু'জনের মধ্যে। আম্মা আমাকে যা জানালেন, সেইটুকুই জানি আমি।

ঃ কি জানালেন তিনি?

ঃ তিনি জানালেন আব্বার ঐ পাকিয়ে তোলা শাদি আমি না করলেও আব্বা আমাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, যদি সত্বর আমি শাদি করে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরি।

ঃ বেশ তো। সে তো খুব ভাল কথা। এতে তো চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। তাহলে দু'একদিনের মধ্যেই শাদির কাজটা সম্পন্ন করে ফেলি আমরা।

ঃ হ্যাঁ, তা ফেলতেই হবে শিগগির। আব্বা বাড়িতে আমার বউ দেখতে চান জলদি।

ঃ বেশ তো। শাদির পরেই তোমার বাড়িতে যাবো আমি একবার।

ঃ আরো কথা আছে। আব্বা চান পর্দানশিন নামাযি মেয়ে। জেরিনা অবহেলে বললো– এটাই বা এমন কি শক্ত কাজ? আর তো আমি গেঞ্জিপ্যান্ট পরিনে। শাড়ি ব্লাউজ ধরেছি, শাড়ি ব্লাউজ পরেই থাকবো। আর নামায? নামাযটাও একটু-আধটু পরতে শুরু করবো।

আজিজুল হক অসহায় কণ্ঠে বললো– একটু-আধটুতে হবে না জেরিনা। আমার আব্বা চান, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া আর পুরোপরি পর্দা-আব্রু করা মেয়ে।

এবার জেরিনা শঙ্কিত হয়ে উঠলো। বললো– কেমন-কেমন?

ঃ আমি তোমাকে শাদি করলে, তোমাকে নামায পড়তে হবে পাঁচ ওয়াক্ত। রোযা রাখতে হবে অন্তত সবগুলো ফরজ রোযা। আর ঐ শাড়ি ব্লাউজেই হবে না, বাড়ির বাইরে বেরুতে হলে বোরকা পরতে হবে।

চমকে উঠলো জেরিনা। দু'চোখ ফুটিয়ে তুলে বললো– বোরকা!

ঃ হ্যাঁ, বোরকা। এখনকার মতো এমন স্বাধীনভাবে যখন-তখন বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না তুমি। নিতান্তই প্রয়োজনে যখন যাবে, তখন রীতিমতো বোরকা পরে বেরুতে হবে ঘর থেকে।

দিশেহারা হয়ে গেল জেরিনা। উত্তেজনায় কাঁপ ধরলো তার শরীরে। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বললো– অসম্ভব! ইম্‌পসিব্‌ল! এটা কখনো সম্ভব নয়?

ঃ সম্ভব নয়! কোনটা সম্ভব নয়?

ঃ ঐ বোরকা পরা আর বাড়ির বাইরে বেরুনোর এই রেস্ট্রিকশান। এই বাধা নিষেধ চলবে না।

ঃ বাধা-নিষেধ তো নেই তেমন। জরুরি কাজে অবশ্যই বাইরে বেরুতে পারবে তুমি।

ঃ আর অজরুরি কাজে? সেরেফ জরুরি কাজে কেন? যেসব জরুরি নয় সেসব কাজে?

ঃ যেমন?

ঃ সভা-মিটিংএ যাওয়া, নাটক-সার্কাস সিনেমায় যাওয়া, শপিং-মার্কেটিংসহ বন্ধু-বান্ধবির বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া এসব বন্ধ থাকবে কেন? এসব বন্ধ করে কি খাঁচায় উঠবো আমি?

জেরিনা ফুলতে লাগলো। আজিজুল হক বললো– না-না, সবগুলো তো বন্ধ করতে হবে না। যেগুলো নেহায়েতই ফুর্তি আমোদের জন্যে, সেগুলো ছাড়া জরুরি যেগুলো সেগুলোতে তো বাইরে যেতে পারবে পর্দা-আব্রু করে।

বিগড়ে গেল জেরিনা। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– ও মাই গড্। ফের ঐ পর্দা-আব্রু। বোরকা পরে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা। অসম্ভব-অসম্ভব। এটা কখনো পারবো না আমি।

আজিজুল হক বেজায় বিস্মিত হলো এসব কথায়। বললো– এসব কি বলছো– তুমি জেরিনা? বুঝে বলছো তো?

জেরিনা দৃঢ়কণ্ঠে বললো– বিলকুল-বিলকুল। বিলকুল বুঝেই বলছি আমি।

ঃ তাজ্জব! তাহলে আমাকে শাদি করার চিন্তা-ভাবনা করেছিলে তুমি কি করে?

ঃ কি করে আবার? শাড়ি ব্লাউজ পরে থাকবো আর মাঝে মাঝে দুই একবার নামাযও পড়বো- এই রকম চিন্তাভাবনা করে।

আজিজুল হক বললো– তা প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা তোমার ঠিক আছে। কিন্তু মুসলমানকে বিয়ে করলে যে শেষ পর্যন্ত তোমাকে পুরোপুরি মুসলমান মহিলা হয়ে যেতে হবে, এটা ভেবে দেখনি? বিধর্মী মেয়ে মুসলমান হলে তারাও পুরোপুরি মুসলমান হয়ে যায়, আর তুমি মুসলমান ঘরের মেয়ে হয়ে পুরোপুরি মুসলমান হওয়ার কথা আদৌ ভেবে দেখনি নাকি?

ঃ কেন, অতটা ভাবতে যাবো কেন? নাস্তিক পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসবো এটা ভেবেছি ঠিকই। কিন্তু তাই বলে একেবারে পুরোপুরি মৌলবাদী পরিবেশে গিয়ে ঢুকবো এটা ভাববো কেন? কিছুটা মুসলমান চাল-চলন মানতে আমি রাজি, কিন্তু কড়াকড়িভাবে মুসলমান রীতিনীতি মেনে চলা আমার কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঃ তা সম্ভব না হলে আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি থাকবে কি করে? সেখানে তো প্রত্যেকেই ইসলামের বিধিবিধান নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেন।

ঃ সে আবার কি? তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকবো আমি মানে?

ঃ তাহলে শাদির পরে কোথায় থাকবে ভেবেছিলে তুমি? তোমার এই পিত্রালয়ে আর তোমার পিতার সাথে?

ঃ না, তা থাকবো কেন? ভেবেছি, পৃথক বাসা নিবো আমরা। পৃথক বাসা নিয়ে তোমার সাথেই থাকবো।

ঃ কিন্তু আমাকে বিয়ে করলে তো তোমাকে আমার বাড়িতে গিয়েই থাকতে হবে। পৃথক বাসা নিলেও আমার বাড়ির যে চাল-চলন, সেইভাবেই চলতে হবে

তোমাকে। কারণ সেখানে কেবল তুমি-আমিই থাকবো না, আমার আব্বা-আম্মাও এসে মাঝে মাঝেই থাকবেন।

জেরিনা চিৎকার করে বললো– ও গড্ সেভ্ মী! এ যাবৎ আমি খামাখা একি ছাইয়ের দড়ি পাকিয়ে বেড়ালাম? এখন তো দেখছি, তোমাকে বিয়ে করা কখনোই সম্ভব ছিল না আমার।

ঃ কেন, সম্ভব ছিল না কেন?

ঃ ঐ পর্দা-আব্রু করার কথা ভাবতেই পারিনে আমি। সেটা ভাবতে গেলেই শিউরে উঠি আমি। চৌদ্দহাত কাপড়ের অবগুণ্ঠনের মধ্যে ঘরের কোণে বন্দি হয়ে থাকবো আমি এটা আমার কল্পনারও অতীত।

ঃ তাহলে কীভাবে থাকবে বলে আশা করেছিলে তুমি?

ঃ এখন যেভাবে আছি, এইভাবে। এর সাথে বড়জোর দিনে দু'এক বার নামায টামাজ পড়বো। এর বেশি এক ইঞ্চি এগুনো আমার সম্ভব নয় আর তা এগুনোর কথা ভাবীওনি আমি।

ঃ তাহলে তো আমারও সম্ভব নয় তোমাকে শাদি করা।

ঃ সম্ভব না হলে আমার কিছু করার নেই। কোন পর্দা-আব্রু করতে আর চৌদ্দহাত কম্বল জড়িয়ে ঘরের কোণে বসে থাকতে মরে গেলেও আমি পারবো না। বাইরে আমাকে বেরুতেই হবে আর স্বাধীনভাবে চলতেই হবে আমাকে। নইলে দম বন্ধ হয়ে নির্ঘাত মরে যাবো আমি।

ঃ বটে! সত্যিই আমাকে শাদি করতে চাও না তুমি তাহলে?

জেরিনা অবিচল কণ্ঠে বললো– নিজের প্রাণ বাঁচানো ফরজ কাজ। নিজের মৃত্যু সাধ করে ডেকে আনতে চায় কোন পাগল?

ঃ নাঃ! একি আজগুবি ভাবনা ভাবছো তুমি? ইসলামের নিয়ম-কানুন পালন করে চললে কেউ মরে না বা মারা যায় না। ববং তা শরীর মন আর নিরাপত্তার জন্যে খুবই প্রয়োজন। ওদিকে আবার একাজটাও মোটেই কঠিন নয়, অত্যন্ত সহজ। অভ্যাস নেই বলে এত কঠিন ভাবছো তুমি। আস্তে আস্তে অভ্যাস করলে দেখবে, সব পানির মতো তরল আর সিম্‌প্‌ল হয়ে গেছে।

ঃ আমার দেখে কাজ নেই। আমার সাফকথা, আমারভাবে তুমি যদি চলতে পারো, তাহলে তোমাকে শাদি করতে এখনই আমি প্রস্তুত। আজই। আর তোমারভাবে আমাকে যদি চলতে বলো, তাহলে জীবনেও তোমাকে শাদি করবো না আমি।

ঃ আশ্চর্য! এই তোমার ভালবাসা? একমাত্র আমাকে ছাড়া আর কাউকেই শাদি করবে না তুমি এই কি তার আলামত? তামামই কি ভাঁওতাবাজি নয় তোমার?

ঃ নেভার! কখ্খনো নয়।

ঃ নয়?

ঃ কেন হবে? তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কি শাদি করতে যাচ্ছি আমি যে, ভাঁওতাবাজি বা কথার বরখেলাপ করা হবে আমার?

ঃ যাচ্ছো না?

ঃ কখ্খনো না। বিয়ে না হলে না হতে পারে। কিন্তু কথার বরখেলাপ হতে পারে না কিছুতেই।

ঃ তাজ্জব। তাহলে তোমার শেষ কথা কি?

ঃ ঐ একটাই। পর্দা, আব্রু আর ইসলামী চালচলন পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তোমাকে বিয়ে করাও আর সম্ভব নয় আমার।

ঃ তাহলে মত পরিবর্তন করলে?

ঃ হ্যাঁ, করছি। করতে বাধ্য হচ্ছি।

ঃ তাহলে যে আমার বাড়ি যাওয়ার সময় তুমি বলেছিলে কখনোই মত পাল্টাবে না তুমি, তাহলে কি সেটা মিথ্যা কথা বলেছিলে?

ঃ না, সত্যি কথা বলেছিলাম। কথাটা ছিল তাড়াতাড়ি বিয়ে করা নিয়ে। তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে অমত হবে না আমার, কথাটা ছিল এই মর্মে এর মধ্যে তোমার ঐ পর্দা-আব্রু আর তোমাদের ইসলামের ঐ কট্টোর রীতিনীতি পালন করার কোন কথা ছিল না।

ঃ তাহলে সত্যি সত্যিই শাদি তুমি করছো না আমাকে?

জবাবে জেরিনা বিরক্তির সাথে বললো– এক কথা বার বার বলতে ভাল লাগে না আমার। তোমাকে বিয়ে করার অর্থ যা বোঝালে, তাতে তোমাকে আমার বিয়ে করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ স্বপন দেখা থেকে বিরত হও তুমি এখন।

আজিজুল হক নিঃশ্বাস ফেলে বললো– তাহলে তোমাদের এখান থেকে বিদায় হতেও হয় আমাকে এখন, এই তো?

চমকে উঠলো– জেরিনা আবার। ব্যস্তকণ্ঠে বললো– না-না, তা নয় তা নয়। বিদায় হবে কেন? এখানে তুমি চাকরি করছো স্কুলে। আমাদের ফ্যামিলির সাথে একাত্ম হয়ে গেছো তুমি। তুমি বিদায় হবে কি কারণে? বউ হতে না পারি, তোমার তো একজন প্রিয় বান্ধবী হতে পারি আমি? দোহাই এ চিন্তা তুমি করো না। বিয়ে না হওয়ার আঘাতের উপর এই খাঁড়ার ঘা'টা আর দিও না।

আজিজুল বিষন্ন কণ্ঠে বললো– বটে! এটাতো সেরেফ গোড়া কেটে গাছের মাথায় পানিঢালা। এর কি কোন মূল্য আছে, না অর্থ আছে কিছু?

ঃ আছে-আছে। আমার বাবার অসহায় মুখের দিকেই তাকাও না একবার। পারবে তুমি ঐ লোকটাকে কাঁদাতে? তুমি চলে যাবে শুনলে, তাঁর বুকে সেটা কি নিদারুণভাবে বাজবে, সে কথাটাই স্মরণ করো একবার।

ঃ জেরিনা!

ঃ দোহাই! তোমার পায়ে পড়ি। বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি। গভীরভাবে ভালবাসি। সুতরাং মরার উপর খাঁড়ার ঘা আর দিও না। এখান থেকে চলে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা তুমি ত্যাগ করো, ফর গড্‌স্ সেক্, একেবারেই ত্যাগ করো–

দু'চোখে পানিতে ভরে এলো জেরিনার। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে, দুই হাতে মুখ ঢেকে তখনই সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল দৌড় দিয়ে।

অতঃপর আজিজুল হকের মনোভাব টের পেয়ে এ বাড়িতে তার থেকে যাওয়ার জন্যে বাড়ির সকলেই তাকে যার পর নেই অনুরোধ করতে লাগলো। কিন্তু নাস্তিকদের আস্তে আস্তে আস্তিক বানানোর এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আজিজুল হক এ বাড়িতে রয়ে গিয়েছিল। জেরিনাই ছিল তার সেই পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু জেরিনা সে কেন্দ্র থেকে ছিটকে যাওয়ায়, ভেস্তে গেল তার পরিকল্পনা। ফলে এই নাস্তিক পরিবেশে আর একদন্ডও থাকার ইচ্ছা হলো না তার। সেইদিনই সন্ধ্যার পর নিজের কাপড়-চোপড়ের ব্যাগটা হাতে নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে সে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো জেরিনাদের বাড়ি থেকে। বাগেরহাট শহর থেকে বেরিয়ে আসার পর, যাওয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা তার সামনে ছিল না। মায়ের মরামুখ দেখার ভয়ে সে বিয়ে না করে একা একা বাড়িতে যেতেও পারলো না। ফলে, সে পা বাড়ালো একেবারেই অনির্দিষ্ট পথে। সেইদিন আর সেখান থেকেই একেবারে দেশান্তরী হয়ে গেল আজিজুল হক। ফিরতে লাগলো দেশের বিভিন্ন বিভাগে আর এলাকায়।

পাঁচ.

নূরপুরে গেদু মিয়ার টী-ষ্টলে বসে কাহিনীটা এই পর্যন্ত বর্ণনা করে মুসাফির সাহেব গেদু মিয়াকে বললেন– আমিই সেই আজিজুল হক। বুঝলে গেদু মিয়া, সে আজিজুল হক আমিই।

তন্ময় হয়ে কাহিনীটা শুনতে থাকায় গেদু মিয়া অনেকটা সংবিৎহীন ছিল। মুসাফির সাহেবের এ কথার তৎক্ষণাৎ খেই ধরতে না পেরে গেদু মিয়া বললো– জি হুজুর, কি বললেন?

মুসাফির সাহেব বললেন– তোমাদের এই মুসাফির সাহেবই এ কাহিনীর ঐ আজিজুল হক। পথে নামার পর থেকেই আজিজুল হক নামটা হারিয়ে গেল আমার। আমি মুসাফির বনে গেলাম বুঝেছো, সেরেফ মুসাফির।

গেদু মিয়া এবার সরবে বলে উঠলো জি হুজুর, সেটা বুঝতে পেরেছি এ কাহিনীর শুরুতেই। শুধু বুঝতে পারছিনে এই জেরিনা ম্যাডামই ঐ মিস্ জেরিনা কিনা।

ক্লীষ্ট হাসি হেসে মুসাফির সাহেব বললেন– পাগল! কার সাথে কাকে গুলিয়ে ফেলছো!

গেদু মিয়া বললো– কেন হুজুর, গুলিয়ে ফেললাম কি করে? নামটা তো একই। ইনিও জেরিনা, উনিও জেরিনা, দুজনের নামের সাথেই আবার জাহানারা বেগম কথাটাও আছে।

ঃ হ্যাঁ, সেইজন্যেই তোমাকে সেদিন বলেছিলাম– ঐ নামটা, আমার খুব পছন্দ। কিন্তু তাই বলে এই জেরিনাই ঐ জেরিনা হবে কি করে? একই নাম কি একাধিক লোকের হয় না? এই যেমন তোমার নাম গেদু মিয়া। এই গেদু মিয়া নামটা কি গোটা দেশে আর কারো নেই?

গেদু মিয়া বললো– জি হুজুর, তাতো আছে। তবে মুসাফির সাহেব কিছুটা নাখোশ কণ্ঠে বললেন– ফের ঐ তবে কিন্তু টানছো কেন? দেখছো না, ঐ নামটারই মিলটুকু আছে যা। ঐ নামের মিল ছাড়া পরিস্থিতি পরিবেশ সবই তো সম্পূর্ণ আলাদা।

ঃ হুজুর!

ঃ কোথায় এই জেরিনা ম্যাডাম আর কোথায় ঐ মিস্ জেরিনা। হুঁঃ! কিসে আর কিসে! এই জেরিনা ম্যাডাম একটা সাচ্চা মুসলিম পরিবারের একজন যথাযথ পর্দানশিন মহিলা। নিষ্ঠার সাথে পর্দা-আব্রু করে চলেন ইনি। নামায রোযা করেন কায়মনো প্রাণে। অথচ ঐ মিস্ জেরিনা একজন ধর্মহীন নাস্তিক পরিবারের বল্গাহীন মেয়ে। পর্দা আব্রুর নামে শিউরে উঠে সে। নামায রোযার ধার ধারেনা ভুলেও। বেপর্দাভাবে ধেই ধেই করে ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র।

ঃ জি হুজুর, এইখানেই একটা সমস্যা।

ঃ তা ছাড়া, তার বাপের বিপুল সম্পত্তি আর মস্তবড় বাড়ি আছে বাগেরহাটে। তার একটা বোন আছে সেখানে। আছে পঙ্গু বাপ। আরো আছে নাস্তিক পরিবেশের নাস্তিক চাচা-চাচি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। সেসব ফেলে মিস্ জেরিনা এখানে এসে থাকবে কেন? বিশেষ করে, ঐ পঙ্গু বাপকে ফেলে?

ঃ তাইতো হুজুর! সেও তো একটা কথা!

ঃ ওদিকে আবার এই জেরিনা ম্যাডামের সাথে তো আমার সাক্ষাৎ হলো কয়েকবার। পর্দা করে থাকায় তার মুখ আমি না দেখতে পেলেও আমার মুখটাতো দেখতে পেয়েছেন তিনি। ঐ মিস্ জেরিনা হলে সে কেন চিনতে পারবে না আমাকে?

ঃ হয়তো ঐ দাড়ি-গোঁফের জন্যে হুজুর।

ঃ দাড়ি-গোঁফ তো আমার তখনও ছিল। এখন বেশি লম্বা আর ঘন হয়েছে, এই যা। কিন্তু সে জন্যে কি এতটা চেনাজনকে চিনতে ভুল করে কেউ? কণ্ঠস্বরও চিনতে পারতো নিশ্চয়ই। অত্যন্ত নিম্নস্বরের কথা বলার জন্যে তার কণ্ঠস্বর আমি চিনতে না পারলেও, আমার কণ্ঠস্বর তো তার না চেনার কথা নয়?

গেদু মিয়া চিন্তিত কণ্ঠে বললো– তাইতো হুজুর। বলেই চললো আজিজুল হক ইনি ঐ মিস্ জেরিনা হলে, চিনতে পেরেও কি এমন নিশ্চুপ কখনো থাকে? যতই সে পর্দাহীন আর বেনামাযি মেয়ে হোক, আমাকে সে ভালবাসতো মনেপ্রাণেই। এতদিন পরে আমাকে দেখে কি সে আকুল হয়ে না উঠে পারতো? পারতো এমন নির্বিকার থাকতে?

ঃ ঠিকই তো হুজুর, ঠিকই তো! এসব কোন কথাই তো ফেলে দেয়ার নয়। না-না, আপনার কথাই ঠিক হুজুর। ইনি ঐ মিস্ জেরিনা নন।

ঃ আরো কথা আছে গেদু মিয়া।

ঃ হুজুর।

ঃ এই জেরিনা ম্যাডাম বিবাহিতা মহিলা। তার ছেলে আছে দশ-এগার বছরের। মাত্র বারো বছর হলো আমি ছেড়ে এসেছি তাদের। হিসাব করে দেখলে, আমি চলে আসার এক বছরের মধ্যেই শাদি হয়েছে মিস্ জেরিনার। নইলে দশ-এগার বছর বয়সের ছেলের সে মা হতে পারে না। হঠাৎ করে এমন কি ঘটলো যে আমি চলে আসার সাথে সাথে শাদি করতে হলো তাকে? তাও আবার পর্দানশিন ঘরেই শাদি করতে হলো?

ঃ হুজুর!

ঃ মিস্ জেরিনাকে আমি খুব ভালভাবেই চিনেছি গেদু মিয়া। নাস্তিক হোক আর যা-ই হোক কথার বরখেলাপ করার মেয়ে সে নয়। আমাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না বলে সে যখন কথা দিয়েছে একবার, তখন এত তাড়াতাড়ি সে কিছুতেই শাদী করতে পারবে না। মত পাল্টাতেও দু'চার বছর সময় লাগার কথা। বিশেষ করে সে যেখানে সত্যি সত্যিই ভালবাসতো আমাকে। এত তাড়াতাড়ি আমাকে সে ভুলে যেতে পারে না।

ঃ বুঝেছি হুজুর বুঝেছি। সত্যিই উনি মিস্ জেরিনা নন। এতসব কিছুতো খেয়ালে আনিনি আমি! সবকথা শুনেও এতসব গুরুত্বপূর্ণ দিক আমি বিবেচনায় নেইনি। তাই মোখতাছার নামের ঐ মিলটা দেখেই একজনের সাথে আর একজনকে গুলিয়ে ফেলেছি আমি।

www.boighar.com

ঃ বুঝতে পেরেছো তাহলে?

ঃ জি-জি। আর সন্দেহ নেই। মানে, এনিয়ে আর কিছু বলার নেই। তবে, অন্য একটা কথা যে এখন না বলেই পারছিনে হুজুর?

ঃ বলো।

ঃ ঐ মিস্ জেরিনার আর কি কোন খবর নিয়েছেন হুজুর? এই বারো বছরের মধ্যে?

সচকিত হয়ে উঠে মুসাফির সাহেব বললেন– অ্যাঁ?

ঃ কীভাবে তারা আছে, শাদি হয়েছে কিনা তার, বেঁচে আছেন কিনা তার সেই পঙ্গু বাপ এসব কি কিছু জানেন?

মুসাফির সাহেব থতমত করে বললেন– না গেদু মিয়া, আর কিছু জানিনে।

ঃ সে কি হুজুর! একি অসম্ভব কথা বলছেন? এতটাই যেখানে মিস্ জেরিনা ভালবাসতো আপনাকে আর ঐ পঙ্গু ভদ্র লোকটার জন্য এতটাই যেখানে করেছেন সেখানে এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে এতটুকুও খোঁজ নিলেন না তাদের? এটা কি কোন ধর্মের কথা হলো?

মুসাফির সাহেব অপরাধীর কণ্ঠে বললেন– তা মানে, তুমি ঠিকই বলেছো গেদু মিয়া! এটা মোটেই ঠিক হয়নি। দুএকবার তাদের কথা মনে হলেও ক্ষোভে আর অভিমানে যাওয়াই হয়নি ওদিকে।

ঃ না গিয়ে কি করে পারলেন হুজুর? আপনিও তো তাকে কম ভাল বাসতেন না?

মুসাফির সাহেব কম্পিত কণ্ঠে বললেন– গেদু মিয়া!

গেদু মিয়া বললো– একবার সেখানে যান হুজুর। যদিও বাগেরহাট এখান থেকে অনেক দূরে তবু অল্পদিনের মধ্যেই একবার সেখানে আপনি যান। অন্তত একবার চোখের দেখাটা দেখে আসুন– কি হালে আছেন তাঁরা আর এখন কি অবস্থা ওখানে!

ঃ গেদু মিয়া।

ঃ এতটা ভালবাসাবাসির ব্যাপার যেখানে, আপনার অসুখে এতটা প্রাণ ঢেলে সেবা করলেন যে মেয়ে, সেরেফ অভিমানের বশেই তাঁর কথা ভুলে রইলেন হুজুর? আপনি মুসাফির। আপনার ঠিকানা ওরা জানেন না বলেই হয়তো আপনার খোঁজ করতে পারছেন না ওরা। কিন্তু আপনি তো তাদের ঠিকানা জানেন!

এবার উদ্বেলিত হয়ে উঠে মুসাফির সাহেব বললেন– ঠিক বলেছো গেদুমিয়া, তুমি ঠিক বলেছো। আমার চোখের পাতা খুলে দিয়েছো তুমি। ঠিকই একবার যাওয়া আমার উচিত ছিল সেখানে। উচিত ছিল তাদের অবস্থাটা জেনে আসার। ভুল করেছি আমি, মস্তবড় ভুল করে ফেলেছি।

ঃ সেই ভুলটা এবার তাহলে ভাঙ্গুন হুজুর। কে বলতে পারে, মিস জেরিনা হয়তো আজও আপনার পথ চেয়ে আছেন।

প্রবল আবেগে মুসাফির সাহেব আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। আকুলকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা পারেই তো-তা পারেই তো। তার মতো মেয়ের পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব নয়। আমার মন বলছে, হয়তো ঠিকই তাই সে আছে।

ঃ যাবেন তো হুজুর সেখানে তাহলে?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবো। অল্পদিনের মধ্যেই আমি যাবো। এভাবে তার কথা আমি ভাবিনী কখনো। সে আমাকে ভুলে গেছে, না আমার আশাতেই বসে আছে–

এভাবে চিন্তা করিনি কখনো। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছো গেদু মিয়া। শিগগিরই আমি যাবো।

ঃ যাবেন? আল হামদুলিল্লাহ! তা আর একটা কথা বলবো হুজুর?

মুসাফির সাহেব সাগ্রহে বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো-বলো!

গেদু মিয়া ইতস্তত করে বললো– তা কথাটা হলো, ঐ যাওয়ার সময় আমি আপনার সাথে গেলে কি আপনার আপত্তি আছে হুজুর?

মুসাফির সাহেব বিভ্রান্তকণ্ঠে বললেন– অ্যাঁ কি বললে?

ঃ আমি আপনার সাথে যেতে চাচ্ছি হুজুর। আপনার এই কাহিনীটা শুনে আমারও একবার দেখার ইচ্ছে হচ্ছে তাঁদের সবাইকে। বিশেষ করে, ঐ মিস্ জেরিনাকে। নেবেন আমাকে সাথে? গিয়ে আমি একটু দেখেই ফিরে আসবো।

ঃ তুমি! সেকি! তুমি যাবে অতদূরে?

ঃ ক্ষতি কি হুজুর? টানা যাবো আর টানা ফিরে আসবো। খরচের জন্যে ভাববেন না হুজুর। আমি গরিব মানুষ হলেও এটুকু খরচ করতে আমার কোনই অসুবিধে হবে না।

ঃ না-না, সে কথা ভাবছিনে। ভাবছি, আমি তো আর সরাসরি তাদের বাড়িতে যাবো না। ফাঁকে থেকে আগে অবস্থাটা জেনে নেবো। অবস্থা অনুকূল হলে তবে যাবো সেখানে।

ঃ আমিও আপনার সাথে সাথেই থাকবো হুজুর। অবস্থা অনুকূল না হলে আমিও ফিরে আসবো আপনার সাথেই। এসব ক্ষেত্রে সাথে একজন লোক থাকতে দোষ কি? এসব খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে কোন বিপদ-আপদও তো ঘটতে পারে?

মুসাফির সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ, তা পারে বৈকি। পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে, অবশ্যই তা পারে। পরিবেশটা তো একেবারেই নাস্তিক আর ইসলাম বিদ্বেষী পরিবেশ।

ঃ তবে? নিন হুজুর, আমাকেও সাথে নিন আপনার আর অল্পদিনেই যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করুন।

ঃ ঠিক আছে। চলো তুমি আমার সাথে। তবে যাই বললেই– তো যাওয়া যাচ্ছে না। এদিকের সবকিছুর সুবন্দোবস্ত করে রেখে তবে তো যেতে হবে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ছাত্র পড়ানো না হয় না পড়ালাম কয়েকদিন। কিন্তু কাজী বাড়ির মসজিদে ইমামতি করি আমি। সেটার ব্যবস্থা করতেই হবে। ইমামতি করার জন্যে একজন লোক ঠিক করে দিয়ে তবে যেতে হবে। পালিয়ে গেলে তো আর ফিরে আসতেই পারবো না।

ঃ তাহলে আজকেই গিয়ে সে ব্যবস্থা করুন হুজুর। দুই-একদিনের মধ্যেই যাতে করে বেরিয়ে পড়া যায়, সেই ব্যবস্থা করুন।

গেদুমিয়ার আগ্রহ দেখে মুসাফির সাহেব হেসে বললেন– আচ্ছা-আচ্ছা, তাই হবে।

ঃ আর একটা কথা হুজুর। ফিরে আসার পথে আপনার আব্বা-আম্মাদেরও খোঁজ নিয়ে আসা যাবে, না কি বলেন?

গেদু মিয়া হাসিমুখে একথাটা বললো। কিন্তু শুনে দমে গেলেন মুসাফির সাহেব। বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– না গেদু মিয়া, সেটা সম্ভব নয়।

ঃ সম্ভব নয়? কেন হুজুর?

ঃ সব কথাই কি ভুলে গেলে এর মধ্যে, না আমার কাহিনীটাই মন দিয়ে শুনোনি? বললাম না, বউ না নিয়ে বাড়ি ফিরলে মায়ের মরা মুখ দেখতে হবে আমাকে? বউ ছাড়া সেখানে আমি যাবো কি করে?

ঃ ও হ্যাঁ, তাইতো– তাইতো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথাটা। তা হুজুর, আপনার বাড়ির খবর, বিশেষ করে, আব্বা-আম্মার খবরটা কি রাখেন হুজুর? কি হালে তাঁরা আছেন– এসব খোঁজ-খবর কি নেন, না ঐ মিস্ জেরিনাদের মতো সে খবরও–

ঃ না গেদু মিয়া। তাঁদের খোঁজ আমি মাঝে মাঝেই করি। আল্লাহর রহমতে তাঁরা সহি-সালামতেই আছেন।

ঃ বেশ- বেশ। তাহলে ঐ কথাই রইলো হুজুর, দুই একদিনের মধ্যেই রওনা হচ্ছি আমরা।

ঃ ইনশাআল্লাহ।

ইতোমধ্যেই দূর এক মসজিদ থেকে এশার আযান ভেসে এলো। শুনেই মুসাফির সাহেব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন– এইরে! এশার ওয়াক্ত হয়ে গেছে আর এখনো আমি এখানে! উঠি গেদু মিয়া এখনই যেতে হবে আমাকে। এশার জামাত ধরতে হবে কাজী বাড়িতে।

ঃ জি আচ্ছা হুজুর, আসুন।

গেদু মিয়ার স্টল থেকে তখনই বেরিয়ে এলেন মুসাফির সাহেব। দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলেন। সামান্য পথ এগুতেই একজন লোক হঠাৎ তাঁর সামনে পড়ায়, মুসাফির সাহেব প্রশ্ন করলেন– কে? তুমি এলাহী বকসো নও?

সালাম দিয়ে লোকটি বললো– জি হুজুর! আমি ঐ জেরিনা ম্যাডামদের বাড়ির কাজের লোক।

সালামের জবাব দিয়ে মুসাফির সাহেব বললেন, তা তুমি হঠাৎ এখানে, এই রাতে? তোমাকে তো এদিকে কোনদিন দেখিনি।

ঃ দেখবেন কি করে হুজুর? জেরিনা আম্মাতো আম্মাদের সব সময়ই বাড়ির কাজে ব্যস্ত রাখেন। বাইরে আসার সময়ই পাইনে।

ঃ আজ পেয়েছো বুঝি?

ঃ জি-জি! আমি একা নই হুজুর, বাড়িতে কাজের চাপ তেমন না থাকায় সবাই আমরা ছুটি পেয়েছি এখন।

ঃ সবাই মানে? সবাই তোমরা কারা?

ঃ আমি, নইমুদ্দীন, জফের– মানে ও বাড়ির চাকর-নকর সবাই। ম্যাডাম বলেছেন, ভেতরে কাজের চাপ এখন কয়েকদিন নেই। এই ফাঁকে তোমরা সবাই বাইরে খানিক ঘুরে-ফিরে নাও। যেতেই পারো না বাইরে, এবার বাইরে ঘুরে ফিরে মনটা তাজা করো। তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি হুজুর।

ঃ ও, তাই বলো! তাইতো বিকেলে তোমাদের জফেরকেও এই পথেই ঘোরা-ফেরা করতে দেখলাম।

ঃ ঐ হুজুর, ঐ ব্যাপার– ঐ ব্যাপার।

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা। তা বেড়াও, আমি যাই–

বলেই মুসাফির সাহেব আবার হাঁটতে লাগলেন দ্রুতপদে।

আর একটা দিনও পার হলো না। এরই মধ্যেই পরিস্থিতি পাল্টে গেল। ভেস্তে গেল গেদু মিয়াদের অতি সত্বর বাগেরহাট যাওয়ার পরিকল্পনা। ইতোমধ্যেই আর এক ইস্যু মুখ্য হয়ে উঠলো।

পরেরদিন ছাত্র পড়ানো ছিল না। তাই ফজরের নামায আদায় করে মর্নিংওয়াকে বেরুলেন মুসাফির সাহেব। সদর ডহর ধরে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ঐ খেয়াঘাট পর্যন্ত গেলেন। আবার যখন ফিরে এলেন গাঁয়ের উপকণ্ঠে, তখন বেলা আটটা আর তখনই ঘটে গেল এক অঘটন। গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। জেরিনা ম্যাডামের প্রেমাকাঙ্ক্ষী একাব্বর আলী মিয়া মুসাফির সাহেবকে তার প্রেমের পথের প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে ঘটালো এই অঘটন। একাব্বর আলীর কারসাজীতে থানা থেকে পুলিশ এসে মুসাফির সাহেবকে গ্রেপ্তার করলো রাস্তায়। **অভিযোগ ঃ** সে ফেবারী আসামী। কোথাও কোন গুরুতর অপরাধ সংঘটিত করে এসে এখানে এই মুসাফিরের বেশে গা ঢাকা দিয়ে আছে এই লোক। খুন বা ডাকাতি কেসের আসামি সে নিশ্চয়ই। অভিযোগ একাব্বর আলীর আর সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে থানা থেকে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করলো মুসাফির সাহেবকে। গ্রেপ্তার করার হেতু মোটামুটি বোঝা গেল এটাই।

রাস্তায় যেখানে মুসাফির সাহেবকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ, সেখানে সে সময় আর কোন লোক ছিল না। গেদু মিয়ার বাড়ির কাছাকাছি ঘটনা। গেদু মিয়া এই সময় এই রাস্তার দিকে এসেছিল। টের পেয়েই সে ছুটে এলো সেখানে। অভিযোগ শুনে সে পুলিশকে অনুনয় করে জানালো, ইনি কোন ফেরারি আসামী নন, একজন নেকমান্দ মুসাফির ইনি, ধর্মপ্রাণ লোক। একে গ্রেপ্তার করা ঠিক

হয়নি তাদের। অতঃপর মুসাফিরকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে গেদু মিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করলো।

কিন্তু সামান্য এই চা-ওয়ালাকে কোন পাত্তাই দিলো না পুলিশ। ঘটনাটা তদন্ত করে না দেখা পর্যন্ত ছাড়া হবে না তাকে এবং সেজন্যে আজকেই তাকে সদরে চালান দেয়া হবে বলে তারা মুসাফির সাহেবকে থানায় নিয়ে গেল।

কোন পথ না দেখে গেদু মিয়া তাড়াতাড়ি তার চায়ের দোকানে চলে এলো এবং জেরিনা ম্যাডামের পথ চেয়ে বসে রইলো। স্কুলের সময় হয়ে আসতেই ছাত্রিরা দলে দলে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা দু'একজন করে আসতে লাগলেন স্কুলে। একটু পরেই চলে এলেন জেরিনা ম্যাডামও। তিনি সদর রাস্তা থেকে স্কুলের দিকে এগিয়ে আসতেই গেদু মিয়া ছুটে এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালো এবং আকুলকণ্ঠে বলতে লাগলো– বাঁচান ম্যাডাম, মুসাফির সাহেবকে আপনি বাঁচান।

থমকে গেলেন জেরিনা ম্যাডাম। বললেন- বাঁচাবো কি রকম? কি হয়েছে তাঁর?

গেদু মিয়া বললো– কিছুক্ষণ আগে, মানে বেলা আটটার দিকে থানার পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেছে।

জেরিনা ম্যাডাম বললেন– হ্যাঁ শুনেছি। আমাদের কাজের লোক এলাহী বকসো এই রকমই একটা খবর দিয়েছে আমাকে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে।

ঃ অ্যাঁ! শুনেছেন। তাহলে তাকে বাঁচান ম্যাডাম। নইলে তাঁকে সদরে চালান করে দেবে।

ঃ দোষ থাকলে দেবেই তো। তা কোথা থেকে গ্রেপ্তার করলো তাকে?

ঃ এই সদর রাস্তার ঐ মাথা থেকে। টের পেয়ে আমি এসে পুলিশকে কত করে বোঝালাম, কিন্তু আমি সামান্য লোক ম্যাডাম, তাই আমার কোন কথাতেই কান দিলো না পুলিশেরা।

ঃ বটে।

ঃ আপনি তাকে বাঁচান ম্যাডাম। আপনি ছাড়া তাঁকে থানা থেকে খুলে আনার আর কোন উপযুক্ত লোক চোখে পড়ছে না আমার। তাই আপনারই পথ চেয়ে বসে আমি।

ঃ তা আমি তাঁকে বাঁচাবো কেন?

ঃ উনি আপনার পরিচিত লোক। আপনার বাড়িতেও গেছেন উনি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন উনি একজন ভাল লোক। একজন ভাল লোককে কি বাঁচাবেন না ম্যাডাম?

ঃ হুঁউ! কি জন্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো তাঁকে। কি তাদের অভিযোগ, তা জানো?

ঃ অভিযোগ তাদের নয় ম্যাডাম। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, অভিযোগ দায়ের করেছে ঐ বেটা একাব্বর আলী। সে থানাতে বলেছে, মুসাফির সাহেব একজন ফেরারি আসামী। খুন বা ডাকাতি করে এসে এখানে সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। তাকে তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করুন আপনারা।

ঃ বলতেই পারে। শুধু একাব্বর আলী কেন, যে কেউ তা বলতে পারে। এমন একজন ভবঘুরে মানুষকে থানায় আটকিয়ে রাখতে যে কেউ বলতে পারে।

ঃ যে কেউ?

ঃ হ্যাঁ, আমরাও তা বলতে পারি। একজন ফেরারি আসামী না হলে, উনি মুসাফির হবেন কেন? খুন বা চুরি-ডাকাতির মতো একটা কিছু–

গেদু মিয়া বাধা দিয়ে বললো– না ম্যাডাম, না-না। মোটেই উনি ফেরারি আসামি নন। কোন খুন-ডাকাতি করেন নি। সে জন্যে মুসাফির হননি উনি। উনি একজন বিবাগী লোক। প্রিয়জনের কাছে দাগা খেয়ে বিবাগী হয়েছেন উনি আর মুসাফির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নানা স্থানে। www.boighar.com

তীর্যক নয়নে চেয়ে জেরিনা ম্যাডাম বললেন– সেকি! তুমি তা কি করে জানলে?

ঃ ঐ মুসাফির সাহেবের কাছেই শুনেছি ম্যাডাম। গত সাঁঝরাতেই সব শুনলাম। আপনার নামের এক মেয়ের কাছে আঘাত পেয়েছেন উনি। তার কাছেই দাগা খেয়ে উনি পথে নেমেছেন বিবাগী হয়ে।

ঃ বলো কি! কেউ দাগা দিলেই তাকে পথে নামতে হবে? তার কি বাপ-মা, বউ-বাচ্চা নেই?

ঃ না ম্যাডাম, বউ-বাচ্চা নেই। উনি তো বিয়েই করেননি ঐ মেয়েটার জন্যে। ঐ মেয়েটা নাকি তাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না বলে কথা দিয়েছিল। তাই উনিও বিয়ে করেননি আজ পর্যন্ত।

ঃ বটে! সেইজন্যেই তাকে মুসাফির হতে হবে কেন? বাপ-মা তো আছে নিশ্চয়ই?

ঃ জি ম্যাডাম, তা আছেন।

ঃ তাহলে বাড়িতে যাবে বাপ-মায়ের কাছে? নিরুদ্দেশ হবে কেন? "জরুর ডাল মে কুচ কালা হ্যায়?। তা না হলে–

গেদু মিয়া ব্যস্তকণ্ঠে বললো– না- না, না ম্যাডাম, দিলে উনার একবিন্দুও কালো দাগ নেই। উনার আম্মা উনাকে জানিয়ে দিয়ে ছিলেন, পর্দানশিন বউ সাথে না নিয়ে একা একা বাড়ি ফিরলে মায়ের মরা মুখ দেখতে হবে তাঁকে। বিয়ে উনি আজও করেন নি, বউ পাবেন কোথায়? তাই সেই ভয়ে তিনি বাড়িতে যেতেও পারেননি।

ঃ হুঁউ! এই ঘটনা? তুমি তাহলে এতটাই জেনেছো?

ঃ জি ম্যাডাম, মাত্র এই গতকাল সন্ধ্যায় আমি তা জানতে পারলাম। কিন্তু এসব কথা থাক ম্যাডাম। দয়া করে আপনি একটু থানাতে যান। তাকে ছাড়িয়ে আনুন থানা থেকে। উনি ফেরারি আসামি নন, আপনি বললেই– থানার লোকেরা বিশ্বাস করবে আপনার কথা।

ঃ কেন, তা করবে কেন?

ঃ করবে ম্যাডাম। আমরা তো সব জানি। আপনাকে, বিশেষ করে আপনার নানা মীর সাহেবকে খুবই সম্মান করে থানার লোকেরা। আপনাদের বিশ্বাস করে খুব।

ঃ তাই? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি তাহলে।

ঃ তাড়াতাড়ি দেখুন ম্যাডাম। দেরি হলে উনাকে সদরে চালান করে দেবে। পুলিশ সে কথা বলেছে। চালান করে দিলে আর কিছুই করার থাকবে না তখন। দোহাই আপনার এখনই একটু দেখুন।

ঃ বাপরে! এতটাই ভালবেসে ফেলেছো তুমি তাকে?

ঃ ভাল মানুষকে কে না ভালবাসে। আপনি ভালবাসেন না? তওবা, আপনি খাতির করেন না তাঁকে?

জেরিনা ম্যাডাম মৃদু হেসে বললো– করিই তো। ভাল মানুষকে তো কিছুটা খাতির করতে হয়ই।

ঃ তাহলে? যান ম্যাডাম। আর দেরি না করে, কি করতে পারেন তাড়াতাড়ি একটু দেখুন!

ঃ আচ্ছা দেখছি- দেখছি। এসেই যখন গেছি, স্কুলে হাজিরাটা দিয়ে গিয়েই দেখছি–

জেরিনা ম্যাডামদের দোকানপাট ও কায়কারবারের তদারককারীর নাম আমির আলী সরকার। লেখাপড়া জানা মুরুব্বি লোক। ঐ দিনই ঘন্টা দু'য়েক পরে মুসাফির সাহেবকে সাথে নিয়ে জেরিনাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন এই আমির আলী সরকার সাহেব। জেরিনা ম্যাডামের নির্দেশ অনুযায়ী মুসাফিরকে নিয়ে তিনি সরাসরি চলে এলেন অন্দরমহলে এবং জানান দিয়ে জেরিনা ম্যাডামের খাস কামরার দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে বোরকা পরা অবস্থায় ঘরেই ছিলেন ম্যাডাম। সরকার সাহেবের সাড়া পেয়ে বললেন– আসুন সরকার চাচা, ভেতরে আসুন।

বাইরে থেকে সরকার সাহেব বললেন– মুসাফির সাহেব সঙ্গে আছেন আম্মা।

জেরিনা ম্যাডাম বললেন– উনাকে নিয়েই এখানে আসুন। উনাকে কিছু বলার আছে আমার।

সরকার সাহেব তবু ইতস্তত করে বললেন– ভেতরে আসবো?

ঃ হ্যাঁ, তাই আসুন। এখন আমার বাইরে আসার অবকাশ নেই।

মুসাফির সাহেবকে নিয়ে সরকার সাহেব ঘরের ভেতরে এলেন এবং জেরিনা ম্যাডামের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কন্যা সমতুল্যা হওয়ায় সরকার সাহেব সালাম দিলেন না জেরিনাকে। কিন্তু তার পাশে দণ্ডায়মান মুসাফির সাহেব কুণ্ঠিত কণ্ঠে সালাম দিলেন জেরিনা ম্যাডামের সামনে এসেই। সালামের জবাব দিয়ে জেরিনা ম্যাডাম সরকার সাহেবকে প্রশ্ন করলেন– কোন অসুবিধে হয়নি তো থানায়? মানে, কোন ঝামেলা করেনি তো পুলিশ?

সরকার সাহেব হাসিমুখে বললেন– কি যে বলেন আম্মা! আপনাদের কথা উঠলে কি কেউ ঝামেলা করতে পারে আর? আপনার চিঠি পড়ে থানার ও. সি. সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন- আরে এই ব্যাপার? যান-যান, নিয়ে যান এই মুসাফির সাহেবকে। ইনাকে নিয়ে গিয়ে সরাসরি ঐ ম্যাডামের কাছে পৌঁছে দিন।

জেরিনা ম্যাডাম সহাস্যে বললেন– আচ্ছা!

সরকার সাহেব বললেন– আরো কথা আছে আম্মা! ও. সি. সাহেব এই মুসাফির সাহেবকে বললেন– কসুর নেবেন না হুজুর! বদ দোআ করবেন না। সন্দেহ দেখা দিলে তো কিছুটা দুর্ব্যবহার করতেই হয় আমাদের। কসুর না নিয়ে আপনি দোআ করবেন আমাদের জন্যে।

ঃ বটে! তাহলে পুলিশেরও সম্মান আদায় করে নিলেন মুসাফির সাহেব?

ঃ তাইতো দেখলাম।

ঃ সাব্বাস। তা আপনি এখন আসুন চাচা। ইনার সাথে আমার কিছু প্রাইভেট কথা আছে। ইনাকে রেখে আপনি এবার আসুন– সরকার সাহেব তবু ইতস্তত করে বললেন– কিন্তু– ম্যাডাম ফের হেসে বললেন– ইনি আমার পরিচিত লোক চাচা। কোন অসুবিধে নেই, আপনি আসুন।

খোশদিলে বেরিয়ে গেলেন সরকার সাহেব। বিস্ময়াভিভূত মুসাফির সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন কাঠ হয়ে। জেরিনা ম্যাডাম এবার মুসাফিরের দিকে নজর দিলেন। বললেন– দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। বসুন ঐ চেয়ারটায়।

খাটের উপর বসেছিলেন জেরিনা ম্যাডাম। খাটের সামনেই পাতা ছিল ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে ছিল একখানা চেয়ার পাতা। ঐ চেয়ারের প্রতি ইঙ্গিত করলেন জেরিনা ম্যাডাম।

সংকুচিতভাবে ঐ চেয়ারে বসতে বসতে বিস্ময়াভিভূত মুসাফির সাহেব কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন– কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে, আমি তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে।

ম্যাডাম বললেন– কেন, ধন্যবাদ জানাবেন কেন? মুসাফির বললেন– জানাবো না? আপনি আমাকে ছাড়িয়ে না আনলে তো পুলিশেরা অনর্থক হ্যারাস করতো আমাকে।

ঃ না করতো না। করতে পারতো না। কারণ, আপনার উপর নজর আমার বরাবরই ছিল।

ঃ বরাবরই ছিল? সেকি! আমার ওপর বরাবরই নজর ছিল আপনার?

ঃ থাকবে না? আমি কি আপনার মতো বিবেকহীন, না হৃদয়হীন যে থাকবে না?

ঃ কি রকম?

ঃ দেখুন তো এই জিনিসটা চিনতে পারেন কিনা? –বলেই বালিশের তল থেকে রুঙ্গিন রুমালে বাঁধা একটা টাকার পুঁটলি বের করে মুসাফিরের সামনে এগিয়ে দিলেন জেরিনা ম্যাডাম। পুঁটলিটার দিকে চেয়েই মুসাফির সাহেব বিচলিত হয়ে উঠলেন। পুঁটলিটা নিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে খুলে ফেললেন পুঁটলিটা। তার মধ্যে টাকা দেখেই চমকে উঠলেন মুসাফির সাহেব। সরবে বলে উঠলেন– একি-একি! এটা তো সেই টাকা বলেই মনে হচ্ছে। ঐ যে সেই–

জেরিনা ম্যাডাম কথার মধ্যেই বললেন– সেই দশহাজার টাকা। ঋণশোধের দশহাজার টাকা। রুমালটা দেখেও সন্দেহ যাচ্ছে না?

ফুটে উঠলো মুসাফির সাহেবের দুই চোখ। থর থর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি। কাঁপতে কাঁপতে বললেন- অ্যাঁ! কে? কে আপনি? আপনি কি-

ঝপ্ করে মাথার বোরকা খুলে ফেললেন জেরিনা ম্যাডাম। উদোম করলেন মুখ। বললেন– দেখোতো, চিনতে পারো কিনা?

ভূত দেখারও অধিক চমকে উঠলেন মুসাফির সাহেব। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন– একি! একি! জেরিনা, মিস জেরিনা। আপনি, মানে তুমি?

ঃ চিনতে পেরেছো তাহলে?

ঃ কি তাজ্জব– কি তাজ্জব! তুমি এখানে। তুমি এখানে কি করে?

জেরিনা ম্যাডাম ক্ষোভের সাথে বললেন– কি করে আর কোন দুঃখে– সে খবরটা কি একবারও নিয়েছো এই বারো বছরের মধ্যে?

ঃ জেরিনা।

ঃ দেখোতো, এগুলো চিনতে পারো কিনা?

এবার দুই শিট কাগজ বাড়িয়ে দিলো জেরিনা। মুসাফির তথা আজিজুল হক চমকে উঠে বললো– একি! এগুলো তো আমার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি। এম. এ. আর বিএ. পাস সার্টিফিকেটের। তুমি এগুলো কোথায় পেলে?

ঃ আমাদের বাড়িতে যে খাটে তুমি শুয়ে থাকতে সেই খাটের তোষকের তলে। একটা দরখাস্তের সাথে এই সত্যায়িত কপিদুটি সংযুক্ত করা ছিল। সরকারি কলেজের অধ্যাপকের পদে দরখাস্ত বলেই মনে হলো।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে– মনে পড়েছে। সরকারি কলেজের অধ্যাপকের জন্যে বিজ্ঞাপন দেখেই দরখাস্তটা লিখেছিলাম, কিন্তু পোস্ট করা আর হয়নি।

ঃ এতবড় একজন বিদ্বান তুমি, সব লাইনেরই এমন একজন তুখোড় ছাত্র- অথচ এসব বিলকুল গোপন করে আমাদের সাথে এভাবে প্রতারণা করে গেলে বরাবর?

ঃ জি? না, মানে–

ঃ এতবড় একজন পণ্ডিত মানুষ এমন অবিবেচক আর হৃদয়হীন যে কি করে হয়– আজও সে হিসেব মিলাতে পারিনি। রাগের বশে আর ঝোঁকের মাথায় একটা মেয়ে না হয় সাময়িকভাবে কারো ইচ্ছানুযায়ী চলতে অস্বীকার করলোই। তাই বলে কি তাকে একেবারেই বর্জন করতে হবে? জীবন থেকে একদম ছেঁটে ফেলতে হবে তাকে? আর কি ফিরেও দেখা হবে না– সে মেয়েটা কি হালে রইলো?

ঃ জেরিনা!

ঃ মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। পরিবেশ পরিস্থিতির জন্যে ভুলের শিকার হয়। কিন্তু মানুষ তো মানুষই। সে ফেরেশতাও নয়, আসমানি কিছুও নয়। মানুষের পরিবর্তন যেকোন সময় আসতে পারে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে যেকোন সময় সে পুরোপুরি বদলে যেতে পারে। এত বড় বিদ্বান মানুষ হয়ে সে চিন্তাটা একবারও করলে না?

ঃ তা-মানে–

ঃ একটা পঙ্গু মানুষের ওপর নির্ভর করে ঐ বন্য পরিবেশে দুই দুইটি সোমত্ত মেয়ে পড়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতিটা কি হলো, তারা স্বর্গসুখে রইলো, না রসাতলে গেল– অন্তত এটা দেখার কৌতূহলও মনে তোমার জাগলো না? সুদীর্ঘ এই বারো বছরেও?

বিপর্যস্ত কণ্ঠে আজিজুল হক বললো– আমি দুঃখিত জেরিনা, আমি লজ্জিত। তোমাকে আমি মনেপ্রাণে ভালবাসতাম। সেই তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় শুধু অভিমানের উপরই মূর্খের মতো এতটাকাল কাটিয়ে দিয়েছি আমি। গতকালই তোমাদের ঐ চা-ওয়ালা গেদু মিয়া আমার চোখের দৃষ্টি খুলে দেয়ায় দুএক দিনের মধ্যেই বাগেরহাট যাওয়ার জোর পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু রাত পোহাতে না পোহাতেই এই ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম।

জেরিনা বললো– সেটা একদিক দিয়ে বিপরীতে হিতই হয়েছে তোমার। অনর্থক হয়রানি থেকে বেঁচে গেলে।

www.boighar.com

ঃ তা ঠিক- তা ঠিক। এবার ওখানকার- ঐ বাগেরহাটের বর্তমান অবস্থাটা বলো তো, শুনি। তোমার আব্বার শরীর এখন কেমন? তিনি কি সহি সালামতে আছেন?

মলিন হলো জেরিনার মুখমণ্ডল। বেদনাসিক্ত কণ্ঠে সে বললো– না।

ঃ না মানে? তিনি কি সুস্থ নেই?

ঃ তিনি ইহলোকেই আর নেই।

আজিজুল হক আর্তনাদ করে উঠলো। বললো– সেকি! ইহলোকেই নেই? তাহলে কবে আর কীভাবে তিনি ইনতেকাল করলেন?

ঃ আমাদের বাড়ি থেকে তুমি চলে আসার মাস তিনেকের মধ্যেই। তাঁর ঐ মৃত্যুর জন্যে তুমিই ষোলআনা দায়ী।

ঃ আমি?

ঃ হ্যাঁ তুমি। তোমাকে আমি বলেছিলাম না, দোহাই তোমার, আমাদের বাড়ি ছেড়ে তুমি যেও না? তুমি চলে গেছো– এ কথা শুনলে আমার আব্বা এ আঘাত সহ্য করতে পারবেন না– বলেছিলাম না বার বার? কিন্তু তুমি শোনো নি সে কথা। আব্বার পুত্রসন্তান ছিল না। তোমাকে তিনি তাঁর সেই শূন্যস্থানে বসিয়েছিলেন। যখন শুনলেন, তুমি চলে গেছো আর কোন ঠিকানা না দিয়ে চিরদিনের মতো চলে গেছো, তখনই তিনি বজ্রাহতের মতো আঁছাড় খেয়ে পড়লেন।

ঃ জেরিনা!

ঃ সেই সাথেই ভেঙ্গে পড়লো তাঁর শরীর। অসুস্থ হয়ে গেলেন তিনি। শরীরের ঐ অবস্থার ওপর প্রতিদিনই পেতে লাগলেন মানসিক আঘাত। তোমার ঐ আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণে ধিক্কারের তুফান ছুটে গিয়েছিল চারদিক। "মধু খেয়ে উড়ে গেছে মৌমাছি" বলে পথে ঘাটে সবাই তাকে অহরহ ধিক্কার দিতে লাগলো। বিশেষ করে, আব্বা আমাদের প্রগতিবাদীদের মনেপ্রাণে পছন্দ করতেন না বলে, তাদের ধিক্কার দিন দিন তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠতে লাগলো। সইতে সইতে শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারলেন না। টলতে টলতে এসে একদিন শুয়ে পড়লেন বিছানায়। ঐ যে পড়লেন, আর উঠলেন না।

"আহ" বলে আজিজুর হক আর একবার কাতরোক্তি করলো। এরপর বললো– তাহলে মেরিনা, অর্থাৎ তোমার বোন মনোয়ারা বেগম মেরিনা, এখন কার কাছে আছে?

চোখ মুছে জেরিনা বললো– সে তার স্বামীর কাছে আছে।

ঃ স্বামী?

ঃ হ্যাঁ। এটা আমার নানাজানের বাড়ি তাতো শুনেছো। আব্বার মৃত্যুর খবর পেয়ে নানাজান গিয়ে মেরিনাকে নিয়ে আসেন তখনই আর এনে তাকে শাদি দিয়ে দেন। আমাকেও আনতে চাইলেন। কিন্তু আমার দুর্মতি! আমাদের ঐ প্রগতিবাদিতার মোহ আমি কাটাতে পারলাম না। ঐ প্রিয় পরিবেশ ছেড়ে কোথাও যেতে মন আমার চাইলো না। তাই জিদ ধরে আমি ওখানেই রয়ে গেলাম।

ঃ তারপর?

ঃ আমার প্রাপ্য আক্কেল সেলামিটা আমি অল্পদিনেই আর পুরোপুরিই পেয়ে গেলাম। আমাদের ঐ সনামধন্য প্রগতিবাদী অগ্রসর মানুষদের আসল চেহারা

দেখতে পেলাম তখনই। কোন ধর্মের বাঁধন না থাকায় অর্থাৎ পরকালের ভয় না থাকায়, তারা যে স্বভাবতই স্বেচ্ছাচারী, মদ্যপ আর লম্পট- সেটা আগে থেকেই অনেকটা জানতাম। কিন্তু সুযোগ পেলেই যে ঐ তথাকথিত সভ্য আর সুশীল মানুষেরা কতটা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, তখন সেটা সঠিক আর পুরোপুরি অনুভব করতে পারিনি। সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম আমি অভিভাবকহীন আর একা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই। মরা গরুর সন্ধান পেলেই যেমন চারদিক থেকে ধেয়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন, ঠিক সেই রকম আমাকে অরক্ষিত দেখেই আমাদের অগ্রসর মানুষনামক চরিত্রহীন মানুষেরা দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। শকুনের মতো আমাকে খুবলে খুবলে খাওয়ার জন্যে।

আজিজুল হক শিউরে উঠে বললো– সেকি! তারপর? বলেই চললো জেরিনা– বাড়ির বিশ্বস্ত ঝি–চাকরেরা প্রাণপণে আমাকে আগলে রাখার চেষ্টা করলো কিছুদিন। অবশেষে যখন তারা দেখলো, ঐ হায়েনাদের হামলা থেকে আর আমাকে আগলে রাখা সম্ভব নয়, তখন তারা আমাকে জোরতাকিদ দিয়ে বললো– পালাও আম্মাজান, এখনই তুমি তোমার নানাজানের বাড়িতে পালিয়ে যাও। ভদ্রবেশী ঐ লম্পটদের হাত থেকে আর আমরা রক্ষে করতে পারবো না তোমাকে। অসাম্প্রদায়িক নামের ঐ ধর্মহীন স্বেচ্ছাচারীরা মাত্রাধিক বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

আজিজুল হক পুনরায় রুদ্ধকণ্ঠে আওয়াজ দিলো– জেরিনা।

জেরিনা বললো– আমিও দেখলাম, ঘটনা ঠিক তাই। দেরি করলে সত্যি সত্যিই ইজ্জত বাঁচাতে পারবো না আমি। ঐ সময় তোমার অভাবটা যে কতটা বেজেছিল বুকে আমার, কতটা যে মনে মনে চেয়েছিলাম তোমাকে, তা আর কি বলবো? নিরূপায় হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই চলে এলাম নানাজানের বাড়িতে। বাড়ির এক বিশ্বস্ত চাকরই এসে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল এখানে।

এক নিমেষ নীরব থেকে আজিজুল হক ফের প্রশ্ন করলো আর ওখানকার বাড়িঘর-বিষয় সম্পত্তি?

ঃ খানিকটা ঝি-চারকদের দিয়ে এলাম, আর অধিকটাই বেচে দিলাম।

ঃ বেচে দিলে?

ঃ না দিয়ে কি করবো? কে দেখবে আর আগলে রাখবে ওসব? এদিকে নানাজানের এই বিপুল বিষয়-সম্পদেরও একমাত্র ওয়ারিশ আমরা দুই বোন। বোনটা তো থাকে স্বামীর সাথে স্বামীর ঘরে। নানাজানের অভাবে এগুলোই একা আমি কীভাবে সামলাবো, তাই ভেবে বাঁচিনে, তার ওপর আবার অতদূরের বিষয়-বিত্ত। খাবে কে? খাওয়ার কে আছে আমার?

ঃ তা বটে। আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

ঃ করো না। বারণ করছে কে?

ঃ বোরকা-আব্রুর নামে আগে তো আঁতকে উঠতে তুমি। এখন এমন নিষ্ঠার সাথে সেই বোরকা-আব্রু আঁকড়ে ধরেছো যে বড়?

ঃ ঐ যে বললাম, পরিবর্তন আসতে, অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি খুলে যেতে মানুষের বেশিক্ষণ লাগে না? এটা তারই প্রমাণ। তুমি চলে আসার পর থেকেই তোমার কথা গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম আমি। দেখতে লাগলাম প্রগতিবাদের অসারতা আর তোমার কথার যৌক্তিকতা। ভাবতে লাগলাম প্রগতিবাদের নামে এই মেকী সভ্যতার করুণ পরিণতির কথা আর ধর্মহীন মানুষদের হাতে এই সামাজের আশু দুরবস্থার কথা। বুঝে দেখলাম, এই সমাজ, দুনিয়া আর মানুষকে বাঁচাতে পারে– হেফাজত করতে পারে– একমাত্র তোমারই উল্লেখিত এই ইসলাম। ধর্মহীন, কামুক, মদ্যপ আর ঘোর স্বার্থপর মানুষদের দ্বারা এই সমাজে তথা এই বিশ্বে কখনোই শান্তি আসতে পারে না আর আসবেও না কোনদিন। তাতে হানাহানি আর হিংস্রতাই বাড়বে শুধু। চিন্তা করে দেখলাম, এই দুনিয়ায় শান্তি আনতে পারে একমাত্র এবং একমাত্র ইসলাম। ইসলামের নীতি আদর্শ, ইসলামিক জীবনযাত্রা আর ইসলামের আচরণ বিধি।

ঃ চমৎকার! ব্রেভো! তারপর?

ঃ ওখানে থাকতেই ছুড়ে ফেললাম ঐ নাস্তিকদের উগ্র যৌনবাদী ড্রেস। বোরকা-আব্রু করে মন দিলাম ইসলামের নীতি-নির্দেশ পালনে। মীনুর মায়ের দেখাদেখি নিষ্ঠার সাথে শুরু করলাম নামায রোযা। আমাদের ঝি ঐ মীনুর মা-ই আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলো সব।

ঃ মারহাবা। তারিফ করি ঐ মীনুর মায়ের।

ঃ হ্যাঁ, তারিফ সে পাওয়ারই যোগ্য। তাই তাকে অনেক কিছুই দিয়ে এসেছি, যাতে করে তাকে আর ঝিগিরি করে খেতে না হয় অতঃপর।

ঃ সাব্বাস। এটা খুব সওয়াবের কাজই করেছো তুমি। তা আর একটা কথা বলোতো? নাস্তিকতাই ছাড়লে যখন, এই জেরিনা নামটা আজও আঁকড়ে ধরে আছো কেন? তোমার জাহানারা বেগম নামটা তো বেশ ভাল নাম। ওটা চালু করতে পারতে?

ঃ আমি চালু করার কে? চালু করেছেন আমার নানাজান। তাঁর মুখে ঐ জাহানারা নামটা কখনোই আসতো না। এখানে আসার পর থেকেই উনি সর্বত্র সমানে জেরিনা নামটাই জাহির করে বেড়াতে লাগলেন। ফলে জাহানারা নামটা আবার হারিয়ে গেল। কাগজেকলমে আমিই যেটুকু ধরে রেখেছি মাত্র।

ঃ সেকি! মীর সাহেব তো একজন খাঁটি মুসলমান। তাঁর মুখে জাহানারা নাম আসেনি?

ঃ ছিলেন না– ছিলেন না। আমার নানাজানও খাঁটি মুসলমান ছিলেন না। পুরোপুরি নাস্তিক না হলেও, তিনিও ইসলামের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন। এই আমিই এসে তাঁকে হুমকি-ধমকি করে এই পথে এনেছি।

ঃ বলো কি!

ঃ হ্যাঁ, শুধু নানাজানই নন, মনোয়ারাকেও অর্থাৎ মেরিনাকেও একই পথে এনেছি। তারা সবাই এখন সাচ্চা মুসলমান।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

একটু থেমে আজিজুল হক ফের বললো– আর একটা ব্যাপারে ঘোর আমার কাটছে না। তুমি কি এই আজকেই চিনতে পারলে আমাকে? পুলিশে ধরার পরে জানতে পারলে– আমি তোমাদের সেই আজিজুল হক?

জেরিনা হেসে বললো– তা কেন? প্রথম যেদিন দেখি তোমাকে, অর্থাৎ ঐ যে গেদু মিয়ার চায়ের দোকানের সামনে আচমকা আমরা দু'জন মুখোমুখি হয়ে গেলাম, তখনই কিছুটা চিনতে পারি তোমাকে। তাই তো পরেরদিনই চায়ের দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে আনি তোমাকে আর তখন পুরোপুরি নিশ্চিত হই।

ঃ বলো কি! বাড়িতে এনে পুরোপুরি চিনতে পারলে আমাকে?

ঃ একদম সন্দেহাতীতভাবে। তোমার এই বেপরোয়া দাড়ি- গোঁফ-চুল, কিছুই ফাঁকি দিতে পারেনি আমাকে।

ঃ তবু তুমি নির্বিকার রইলে? চিনতে পেরেও কোন রকম শব্দ আওয়াজ করলে না তুমি? আমাকে সে কথা কিছুই বললে না? তুমিই যে আমার সেই জেরিনা, সে কথাটা একটুও জানালে না?

জেরিনা দৃঢ়কণ্ঠে বললো– কেন জানাবো? তুমি মানুষ আছো, না আসলেই খুনি-ডাকাত হয়ে এই ছদ্মবেশ ধরেছো– তা যাচাই করে দেখতে হবে না আমাকে? বিয়ে থা করেছো, না বিয়ে করার নাম করে আরো দু'চারজন মেয়েকে আমার মতো ঠকিয়েছো আর সর্বোপরি আমার কথা আদৌ তোমার মনে আছে কিনা, খোঁজ নিয়ে তা দেখবো না আমি? এই মুসাফির আমার সেই মন ভোলানো আজিজুল হকই আছে, না একেবারেই অমানুষ হয়ে গেছে– তা না জেনেই আত্মপরিচয় দেবো? এই যে তুমি মুসাফির হয়েছো, তা আমারই জন্যে, না অন্য কোন কারণে, তা আগে দেখবো না?

আবেগে দুলতে লাগলো জেরিনা। আজিজুল হক বললো তাজ্জব! তাই বুঝি তুমি সেদিন কথা বলেছো মিন মিন করে? তোমার কণ্ঠস্বর যাতে করে চিনতে না পারি আমি, এই উদ্দেশ্যেই বুঝি কথা বলেছো ঐ রকম নিচু গলায়?

জেরিনা হেসে বললো– একজ্যাক্টলী! আগেই আমি ধরা দিতে চাইনি বলে অমনটি করেছি।

ঃ তা আগে পরিচয় দাওনি তো আজ দিচ্ছো কেন? খোঁজখবর করে কিছু পেয়েছো কি?

ঃ জরুর পেয়েছি। যা কিছু বাঁকি ছিল জানার, চাওয়ালা গেদু মিয়ার কাছে জেনে গেছি সবকিছু। সব আর সম্পূর্ণ কিছু। জেনে গেছি, তুমি ফেরারি আসামি নও, বিবাগী মুসাফির। প্রেমের হাটে পোড়-খাওয়া এক বিবাগী মানুষ।

হাসতে লাগলো জেরিনা। আজিজুল হক সে হাসিতে যোগ না দিয়ে প্রশ্ন করলো– আচ্ছা, তুমি তো জেনে গেছো আমি মুসাফির। নির্দিষ্ট কোন ঠাঁই ঠিকানা নেই। আজ এখানে, কাল সেখানে থাকি। আমাকে চিনতে পেরেও এই যে তুমি পরিচয় না দিয়ে আমাকে যাচাই করে দেখার খেয়ালে থাকলে, আমি যদি ইতোমধ্যেই চলে যেতাম আবার কোথাও? হারিয়ে যেতাম এখান থেকে? তাহলে ঐ যাচাই করে দেখে লাভটা হতো কি?

ঃ বটে?

ঃ আমি ভাল আছি না নষ্ট হয়ে গেছি– এসব জেনেও তো কোন লাভ হতো না তোমার। আমাকে জানাবেই না যখন, শুধু শুধু এই খোঁজ নেয়া আর কেন? যদি পালিয়েই যেতাম?

হাসির মাত্রাটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে জেরিনা বললো– "পালাবার পথ নেই, পিছে আছে হুতুমধুম"।

ঃ পালাবে কি করে? সেই থেকেই তো তুমি আমার নজরবন্দি। চাকর-নফর-কর্মচারী সবাইকেই তো সেই থেকে তোমার পেছনে রেখেছি। ছায়ার মতো তারা ফলো করছে তোমাকে।

আজিজুল হক সজাগ হয়ে বললো– অ্যাঁ বলো কি! তাইতো তাদের দুএকজনকে, মানে তোমাদের এলাহী বকসো, জফের আলী, এদেরকে, রাস্তা-পথে প্রায়ই দেখছি ইদানীং।

ঃ শুধু রাস্তা-পথেই নয়, কাজীবাড়ি পর্যন্ত তারা অনুসরণ করেছে তোমাকে। ইমামতি থেকে ছুটি নিয়ে তুমি কোথায় যেন যাওয়ার তাল করছিলে, গত রাতেই তারা এসে সে কথা আমাকে জানিয়েছে।

ঃ বলো কি। সে কথাও?

ঃ জি-জি। তাইতো তোমাকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হলো। আজ সকালেই যদি পালিয়ে যাও, সেই ভয়ে পুলিশকে খবর দেই ভোর বেলাতেই।

ঃ জেরিনা।

ঃ একাব্বর আলী নামের এক বদমায়েশ তোমাকে ফেরারি আসামি বলে থানায় ইনফরমেশান দিয়ে রাখলেও, সেজন্যে পুলিশ এ্যারেস্ট করেনি তোমাকে। আমি তোমাকে সন্দেহভাজন লোক বলে পুলিশকে জানানো মাত্র সকালে এসে তোমাকে এ্যারেস্ট করে পুলিশ।

ঃ তাজ্জব। একি ভানুমতির খেল শুরু করেছো আমাকে নিয়ে তুমি?

তা সন্দেহভাজনই যদি মনে করলে আমাকে, তাহলে সেই সন্দেহভাজন লোককে আবার এত তাড়াতাড়ি ছাড়লো কি করে পুলিশ?

ঃ ছাড়লো আমার চিঠি পেয়ে। চিঠিতে যে আমি জানালাম, তুমি ফেরারি আসামি নও। তুমি একজন বিবাগী মানুষ আর আমার অতি আপন লোক। অথচ

আমাকে না জানিয়েই তুমি পালিয়ে যাচ্ছো দেখে পুলিশের সাহায্য চেয়েছি আমি। পুলিশ আমাকে সে সাহায্য করায় তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার তোমাকে ছেড়ে দিলে আর আমার প্রেরিত লোকের সাথে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে আমি আরো অধিক ধন্য হবো। এসব কথা চিঠিতে জানালাম।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আমার এই চিঠি পেয়েই তারা ছেড়ে দিয়েছে তোমাকে।

"হুঁউ" বলে ক্ষণিকের জন্যে নীরব হলো আজিজুল হক। এরপর সে নিঃশ্বাস ফেলে আপন মনেই গেয়ে উঠলো– সবই হলো, কিন্তু সময় থাকতে কিছুই হলো না।

ঃ তার অর্থ? একথা বলছো কেন?

ঃ বলছি মানে, অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়লো আমার। আমাদের গ্রামের বাড়ির পাশে কয়েকঘর জেলে বাস করতো। তাদের একজনের নাম বুদু হালদার। বিপত্নীক বুদু হালদার এক বিধবা জোয়ান জেলেনীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। প্রেমে জেলে- জেলেনী- এই দুইজনই আওয়ারা। বিয়েতো দুইজনেরই হয়ে গেছে একবার। এখন হলে হবে নিকাহ। সেই বিধবাকে নিকাহ করার বিধান চেয়ে বুদু হালদার এন্তার ঘুরে বেড়ালো শাস্ত্র বিদদের পেছনে। হাতে-পায়ে ধরতে লাগলো সমাজপতিদের। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বরং উল্টো আরো গালমন্দ আর তাড়া খেয়ে ফিরতে হলো সবার কাছে। তবু বুদু নাছোড় বান্দা হওয়ায়, সমাজপতিরা চরমপথ ধরলো। সালিস ডেকে সমাজপতিরা একদিন "জেলের নিকাহ হয়না– হতে পারে না কোন দিন," বলে বুদুকে বেদম মার মারলো। মেরে শুইয়ে দিলো মাটিতে। মার খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি যাওয়ার সময় বুদু হালদার আফসোস করে বললো– "শালা জেলের নিকাহ ঠিকই একদিন হবে। শুধু এই বুদু হালদার বেঁচে থাকতে হলো না- এই আর কি!"

আজিজুল হক থামলে জেরিনা বললো– এ গল্প দিয়ে কি বোঝাতে চাচ্ছো তুমি?

আজিজুল হক বললো– না, কিছু না। এই একটু কথার কথা বলছি। সেই নামায রোযাও ধরলে তুমি, বোরকাও পরলে, অথচ–

ঃ অথচ! অথচ কি?

ঃ কিছু না। আচ্ছা, স্বামী কোথায় থাকেন তোমার? মানে, এখন কোথায় আছেন?

মুখ তুলে চেয়েই হেসে ফেললো জেরিনা। বললো– কোথায় আবার! এখন এখানেই আছেন।

ঃ এখানে? এই বাড়িতে?

ঃ হ্যাঁ, এখন এখানেই আছেন।

ঃ কই? সেদিনও দেখিনি; আজও তো দেখছিনে?

ঃ দেখতে চাইলেই দেখিয়ে দেবো।

এই সময় ইউসুফ আলী বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে বললো– আম্মা, আম্মাজান, আপনার নানাজান আপনাকে বৈঠকখানায় ডাকছেন। একটু সেখানে যেতে বলছেন।

জবাবে জেরিনা বললো– এখন খুব ব্যস্ত আছি বাপজান। তুমি গিয়ে তাঁকে বলো, খানিক পরেই আমি আসছি।

www.boighar.com

ঃ জি– আচ্ছা, আম্মাজান–

ইউসুফ আলী চলে গেল। আজিজুল হক জেরিনাকে বললো– এইটেই তো তোমার ছেলে, না কি বলো? জেরিনা হাসিমুখে বললো– হ্যাঁ ছেলে বৈকি? ছেলেই তো আমার! তাছাড়া তোমার তালেবে-এলেম। চিনতে পারছো না?

ঃ হ্যাঁ, পারছি তো বটেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, তোমার ছেলেকে সব সময়ই দেখা যায়, অথচ তোমার স্বামী–

কথা শেষ করতে না দিয়েই জেরিনা এবার গরমকণ্ঠে বললো– কি স্বামী-স্বামী করছো? স্বামী এলো কোত্থেকে?

হোঁচট খেলো আজিজুল হক। বিস্মিত কণ্ঠে বললো– স্বামী এলো কোত্থেকে মানে? স্বামী নেই তোমার? শাদি করনি তুমি?

জেরিনা সখেদে বললো– সে সুযোগ পেলাম কখন? সে নসিব কি আজ পর্যন্ত হলো আমার?

আজিজুল হক হতভম্ভ হয়ে গেল। থতমত করে বললো- সেকি! শাদি হয়নি, অথচ সন্তান। তাহলে কি এটা অবৈধ সন্তান তোমার? মানে বিয়ে ছাড়াই–

গর্জে উঠলো জেরিনা। বললো– খবরদার। ছিঃ-ছিঃ। এমন কথাও মুখ দিয়ে বেরোলো তোমার!

আজিজুল হক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। অস্ফুটকণ্ঠে বললো– তাহলে? তাও যদি না হয় তাহলে কার সন্তান এই ইউসুফ আলী?

কণ্ঠে জোর দিয়ে জেরিনা বললো– আমার বোনের সন্তান। আমার বোন মনোয়ারা বেগম মেরিনার সন্তান। আরো সন্তান আছে তার। ইউসুফ আলীকে আমি পালন করছি ছোটকাল থেকে। সে আমার পালিত সন্তান। সে আমাকে তার আর এক মা বলে জানে।

www.boighar.com

উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আজিজুল হকের মুখমণ্ডল। বিপুল উল্লাসে সে বললো– সোবহানআল্লাহ! পালিত সন্তান?

জেরিনা বললো– জি-হ্যাঁ। গর্ভেধারণ না করলেও কি সন্তান থাকে না মানুষের? একে সন্তান রূপেই পালন করেছি আমি।

আনন্দে আবেগে কাঁপতে লাগলো আজিজুল হক। বললো– কি আশ্চর্য! কি তাজ্জব! তুমি বিয়ে করোনি আজও তাহলে?

ঃ আমি কি ধাপ্পাবাজ, না কথার বরখেলাপকারী মেয়ে? আমি কি তখন বারবার বলিনি যে, একমাত্র তোমাকে ছাড়া জীবনেও আর কাউকে বিয়ে করবো না আমি? এ কথা বলার পর আমি অন্য কাউকে বিয়ে করবো– এ কথা তুমি ভাবলে কি করে?

ঃ সোবহানআল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ। একি সুখবর! একি সুখবর! এই সময় জেরিনার নানাজান লাঠিতে ভর দিয়ে ব্যস্তভাবে জেরিনার ঘরে এলেন এবং ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– কি এমন জরুরি কাজে ব্যস্ত আছো তুমি যে, খবর দেয়ার পরও তুমি বৈঠকখানায় গেলে না? ওদিকে চা-ওয়ালা গেদু মিয়া এসে বার বার জানতে চাইছে– মুসাফির সাহেব কোথায়, তাঁকে ছাড়িয়ে আনা হলো কিনা–

আজিজুল হকের ওপর নজর পড়তেই মীর সাহেব চমকে গিয়ে ফের বললেন– আরে কে এটা? ঐ মুসাফির সাহেবই নন?

জবাবে জেরিনা কলকণ্ঠে বললো– না নানাজান, ইনি মুসাফির সাহেব নন। ইনি আপনার নাতজামাই।

চমকের উপর চমক। মীর সাহেব বিভ্রান্তকণ্ঠে বললেন– নাতজামাই! নাতজামাই কি রকম?

ঃ আপনার আপনার হবু নাতজামাই। কয়দিন থেকেই তো আপনাকে বলছি, এতদিন শাদি না করে যার আশায় আজও বসে আছি আমি, আপনার সেই হবু নাতজামাই এখন এই নূরপুরেই আছে? বলছিনে কয়দিন ধরেই? এই মুসাফির সাহেবই আপনার সেই হবু নাতজামাই।

খুশিতে দুলতে লাগলেন মীর সাহেব। বললেন– মারহাবা– মারহাবা! একি খোশখবর– একি খোশখবর! কি হে মুসাফির, ঘটনা কি?

মীর সাহেবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আজিজুল হকও বলে উঠলো– ঐ একই ঘটনা নানাজান– একি খোশখবর– একি খোশখবর!!

সমাপ্ত

www.boighar.com